মিশকাতুল আনওয়ার

বা

[আলোর দীপাধার]

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড

বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০ * বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নিবেদিত। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত রাসূলে পাক (সা) ও তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি রাসূল (সা)-এর প্রাণ প্রিয় সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও আওলিয়ায়ে কেরাম বুর্যুগানে দ্বীন বিশেষ করে এ গ্রন্থের মূল লেখক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র)-এর রূহানী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ইমাম গাজ্জালী (র) ছিলেন একজন জগত বিখ্যাত দার্শনিক, আলেম ও সুফী সাধক। যিনি স্বীয় ক্ষুরধারা লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন সঠিক পথ নিদের্শনা। আর নাস্তিক ও জিন্দীকদের দিয়েছেন দর্শনতত্ত্বের ভিত্তিতে উপযুক্ত ও দাত ভাঙ্গা জবাব। তিনি ছিলেন আওলিয়া কুলের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর রচিত ইহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দিন ও কিমিয়ায়ে সাহাদাত গ্রন্থদ্বয় বিশ্বব্যাপি বহুল আলোচিত। তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানা 'মেশকাতুল আনোয়ার' বা সুবাসিত আলো বা নূর নামক গ্রন্থেরই সরল বঙ্গানুবাদ। এ গ্রন্থখানা মানব জীবনের খুবই উপকারে আসবে বলে মনে করি। তাই এ গ্রন্থখানা কে মানুষের বাস্তব ধর্মী গ্রন্থরূপে অবহিত করা যায়। এ গ্রন্থখানা মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

আমি নিজেকে ধন্য মনে করি যে, একজন প্রকাশক হিসেবে এতবড় এক মহান ব্যক্তির লেখা বই প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি। পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি যে, মানুষ কোন ভুলের উর্দ্ধে নয়। আপনাদের সন্ধানী দৃষ্টিতে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে যা সংশোধনে সহায়ক হবে। বইখানার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রকাশক

মাহমুদউল্লাহ মামুন চৌধুরীপ্রকাশক

সুচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় অধ্যায়

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি দৃষ্টি শক্তি সম্প্রসারিত, আলো ছড়িয়ে, রহস্য প্রকাশ ও পর্দা উন্মোচিত করেন। অতপর হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর প্রতি দরুদ; যিনি আল্লাহ প্রদত্ত আলোয় পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত, বিশেষ গুনাবলী সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রেমিক। সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী এবং পাপ ক্ষমাকারীর পক্ষ হতে মানুষকে ভালো কাজের সুসংবাদ ও মন্দ কাজের দুসংবাদ দানকারী, তাঁর অনুচর-অনুগামী অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামদের প্রতিও সালাম ও দরুদ।

আল্লাহর নূর তথা আলোর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে যারা উৎসুক, বাস্তব চিন্তাধারা ও সাধনা দ্বারা অবাস্তব, অপবিত্রতাকে দূরে ফেলে পবিত্র হোক তাদের অন্তর। আমাকে আপনারা পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহর আলো শিশা, তাক, প্রদীপ এবং জলপাই বৃক্ষের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে? অথচ নবী (সা) বলেছেন– 'আল্লাহর আলো-আঁধারের সত্তরটি পর্দা রয়েছে। তিনি যদি পর্দাগুলো অপসারণ করতেন, মহান আল্লাহর নিঃসরিত আলোকরাশি সকল দর্শককে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করত।

নিঃসন্দেহে প্রশ্নটি জটিল। তবে উল্লেখিত বিষয়টি দিয়ে রুদ্ধদ্বার কামরা খোলার চেষ্টা করা হয়েছে। হাক্কানী ওলামা ও গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্ধা রাখে না যা খোলার। আর একটা সত্য এই যে, সব ধরণের রহস্য ব্যক্ত ও তার প্রকাশ করা চলে না। এ রহস্য কেবলমাত্র মহৎ ব্যক্তিবর্গই গোপন রাখতে পারেন।

কতিপয় তত্ত্বদর্শীর মত– আল্লাহর রহস্য উদঘাটন করা কুফরী। রাসূল (সা)-ও বলেছেন– কোন কোন জ্ঞানী গুপ্তধন সমতুল্য। অন্য কেউ তাদের পরিচয় পান না উলামায়ে রাব্বানীরা ব্যতীত। যারা আল্লাহর গোপনতত্ত্ব সম্পর্কে বঞ্চিত তারাই তাঁদের অমূল্য বাণীকে অস্বীকার করতে পারে। রহস্য গোপন রাখাই শ্রেয় অবুঝদের সংখ্যাধিক্য হলে। কবির ভাষায়–

فَمَنْ مَنَحَ الْجُهَّالَ عِلْمًا اَضَاعَهٗ * وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ فَقَدْ ظَلَمَ -

মুখেরে যেজন ইলম শিখালো নষ্ট করল তায়,
জ্ঞান পিয়াসীরে দানে না যে জ্ঞান জুলুম করল হায়।

আমি এখান আলোচনা অতি সংক্ষেপ, ইঙ্গিত-ইশারায় উপস্থাপন করব। একদিকে আমার মন দ্বিধাগ্রস্থ অন্য দিকে সময় সংকীর্ণ। মনের গতি নিয়ন্ত্রণের চাচি আল্লাহর হাতে। ইচ্ছে হলে তিনি নিঃকোচে খুলে দেন। আমি এ গ্রন্থে তিনটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো।

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মূল নাম মুহাম্মদ। উপাধি হলো হুজ্জাতুল ইসলাম। গাজ্জালী জন্মস্থানগত উপাধি। বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুস জেলার তাহেরান শহরে ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে ৪৫০ হিজরীতে ইমাম গাজ্জালী (র) জন্মগ্রহণ করেন। দাদা সম্মানিত ব্যক্তি হলেও স্বীয় পিতা আহমদ তেমন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না সে এলাকায়। বাল্যকালেই পিতৃহারা হন ইমাম গাজ্জালী (র)। তাঁর পিতা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকলেও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল অনেক। তাই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি ইমাম গাজ্জালী ও তাঁর ছোট ভাই ইমাম আহমদ গাজ্জালীকে স্বীয় বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে অত্যান্ত আবেগের সাথে বলে যান যে, আমি নিজে লেখাপড়া করতে পারিনি। ইচ্ছা ছিল আমার এ সন্তানদেরক লেখাপড়া শিখাব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তা আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি আমার শিশু দুটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার অন্তিম বাসনা পূরণ করবে। অবুঝ দুটি শিশুকে আর নিজের সামান্য যা কিছু সম্পদ ছিল তিনি বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন।

বন্ধুও ছিলেন তাঁরই মত একজন দরিদ্র ও দরবেশ মানুষ। বন্ধুর পুত্রদের প্রাথমিক লেখাপড়ার ব্যবস্থা নিয়ে তিনি ওসিয়ত পূর্ণ করলেন। প্রাথমিক স্তর শেষ হলে স্নেহের স্বরে তাদেরকে বললেন, তোমাদের পিতার প্রদত্ত সম্পদ শেষ হয়েছে, তোমাদের লেখাপড়া এবং ভরণপোষণের জন্য আমারও এমন সামর্থ নেই যা দিয়ে তোমাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করব। তোমাদের পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে হলে কোন অবৈতনিক মাদরাসায়

ভর্তি হতে পার। বাবার ইচ্ছা পূরনের উদ্দেশ্যে উপদেশ মত ইমাম গাজ্জালী (র) ও আহমদ গাজ্জালী ভর্তি হয়ে গেলেন নিকটবর্তী এক অবৈতনিক মাদরাসায়। উল্লেখ্য যে প্রাথমিক স্তরে ইমাম সাহেব কম সময়েই কুরআন হিফয করে নিয়েছিলেন। এখন ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নিলেন সে সময়ের বিখ্যাত ফিকাহবিদ মাওলানা আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ জারকানীর কাছে। অতঃপর তুস ত্যাগ করে জুরজানে গমন করেন উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং উচ্চতর শিক্ষালাভে আত্মনিয়োগ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইমাম আবু নযর ইসমাঈল (র)-এর তত্ত্বাবধানে। তখনকার যুগে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শুধু পুস্তকের পাঠ দিতেন না বরং যাতে পরবর্তীতে কোন বিষয় ভুলে গেলেও তা সংশোধন করে নিতে পারেন। অনুশীলনের জন্য খাতায় লিখিয়েও দিতেন, এসব নোটকে বলা হত 'তালীকাত।' সে নোটগুলো ছাত্ররা অতিযত্নে সংরক্ষণ করত। গাজ্জালী (র) অতি যত্নসহকারে রক্ষা করে রেখেছিলেন তাঁর উস্তাদের তালীকাতগুলো।

শিক্ষা সমাপ্ত করে ইমাম জুরজানীর কাছে থেকে পাওয়া নোটগুলো বুকে জড়িয়ে ইমাম গাজ্জালী (র) নিজ জন্মভূমি তাহেরান উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে ইমাম সাহেবের সেই তালীকাতসহ সর্বস্ব লুট করে নিল একদল দস্যু। অন্যান্য জিনিস পত্রের জন্য তেমন দুঃখিত ছিলেন না তিনি। তালীকাতগুলোর জন্য বিশেষ বিব্রত হলেন এবং নোটগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন দস্যু-সর্দারকে। সর্দার অনুরোধ শুনে উপহাসের হাসি হেসে ইমাম সাহেবকে বলল, তুমি তো দেখি ভাল লেখাপড়া শিখেছ। নোটগুলোর ভেতরেই কি তোমার যাবতীয় শিক্ষা আবদ্ধ? মনে ভিতর কি কিছুই নেই তোমার যে, এগুলোর জন্য এভাবে ভেঙ্গে পড়ছ? উপহাসের পর সর্দার তালীকাতগুলো ফিরে দিল। দস্যু সর্দারের ব্যঙ্গোক্তিতে ইমাম গাজ্জালী (র)-এর মন বিক্ষুব্ধ হলো এবং অল্প সময়েই সে সমস্ত নোট মুখস্থ করে ফেললেন।

নিশাপুর নিযামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন

খ্যাতির শীর্ষে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর নিযামিয়া মাদরাসা তৎকালীন যুগের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। নিযামুল মুলক সুলতান মালিক শাহির প্রধানমন্ত্রী প্রথমে একটি সাধারণ মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে একে

সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। সে সময় এর সমকক্ষ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাগদাদে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সে যুগের সেরা দুই মনীষী ইমামুল হারামাইন ও আল্লামা আবু ইসহাক শীরাজী। খোরাসানের নিশাপুরে থাকতেন ইমামুল হারামাইন আর দ্বিতীয়জন আল্লামা আবু ইসহাক শীরাজী ইরাকের রাজধানী বাগদাদে। তখন মাদরাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ ইমামুল হারামাইন।

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর জন্মভূমি তুসের নিকটবর্তী মাদরাসাটি বিধায় তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ইমামুল হারামাইনেরই শরণাপন্ন হলেন এবং জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেন অতিঅল্প সময়েই। ইমামুল হারামাইনের বিশিষ্ট তিন ছাত্র– হাররাসী, আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইমাম গাজ্জালীর মধ্যে পরবর্তীকালে ইমাম গাজ্জালী যে মর্যাদা অর্জন করেছিলেন তা তাঁর উস্তাদ ইমামুল হারামাইনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ৪৭৮ হিজরী সালে ইমামুল হারামাইন পরলোক গমন করলে সমগ্র দেশবাসী শোকে এমনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, সমগ্র নিশাপুরের হাট-বাজার, দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়, তাঁর চার শতাধিক ছাত্র নিজেদের দোয়াত-কলম ভেঙ্গে ফেলে এবং এক বছর ধরে শোক পালন করে। ইমাম গাজ্জালী নিজেও নিশাপুর ছেড়ে বাগদাদে চলে যান উস্তাদের শোকে অভিভূত হয়ে।

বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ

বাদশাহ সেলজুক মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক ইমাম গাজ্জালীর স্বভাব-চরিত্র ও অগাধ জ্ঞানের কথা শুনে মাদরাসায়ে নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দান করেন। এ মাদরাসার সামান্য একজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ছিল সে সময় এক দুর্লভ সম্মানের বিষয়। আর বিজ্ঞতা যাচাইয়ের পথ ছিল পণ্ডিতদের বিতর্কানুষ্ঠান। প্রথা অনুসারে নিযামুল মুলক ও ইমাম গাজ্জালীকে অধ্যক্ষ নিয়োগ করার আগে এক বিতর্কানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং তাতে তিনি জয়ী হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর।

শাহী বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর প্রভাব

অল্প বয়সে এমন সম্মানজনক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে চর্তুর দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও

ফতোয়ার উপর নির্ভর করে চলতে শুরু করে শাসন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত। আস্তে আস্তে সেলজুক ও আব্বাসীয় সুলতানদেরও শ্রদ্ধাভাজনে পরিণত হন তিনি। তখন রাষ্ট্রীয় শাসনভার সুলতানের হাতে আর আব্বাসীয় খলীফাদের হাতে আধ্যাত্ম সংশোধনের দায়িত্ব। ৪৮৫ হিজরীতে সেলজুক সুলতান মালিক শাহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর চার বছরের শিশু পুত্র আহমদকেই সভাসদগণ সিংহাসনে বসালেন।

মুকতাদের বিল্লাহ তখন খলীফা ছিলেন। আহমদের নামে খোতবা পাঠের ব্যাপারে তাঁর অনুমোদন চাওয়া হলে তিনি তুর্কী খলীফার নামে খোতবা পাঠের শর্তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন দিয়ে দিলেন, কিন্তু দূত হিসেবে ইমাম গাজ্জালীকে তুর্কী দরবারে পাঠালেন আহমদের নামে খোতবা পাঠের অনুমতি চেয়ে। ইমাম গাজ্জালী (র) বিচক্ষণতার সাথে তুর্কীদের রাজি করে আহমাদের নামে খোতবা পাঠের অনুমোদন নিয়ে ফিরলেন। ফলে তাঁর খ্যাতি অধিকতর বৃদ্ধি পেল।

মুকতাদের বিল্লাহর মৃত্যুর পর মোসাতাজহার বিল্লাহ খলীফা হয়ে বাতেনী ফের্কা নামে একটি বিভ্রান্ত দলকে খুব শক্তিশালী হতে দেখে ইমাম গাজ্জালী (র)-কে তাদের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক প্রণয়নের অনুরোধ জানালেন। ইমাম সাহেব মোসতাজহারী নামকরণ করে একটি পুস্তক রচনা করলেন।

ইমাম সাহেবের ওয়াজ-নসীহত ও বিশেষ বৈঠকে শত শত আলিম, আমীর-ওমরা অংশ গ্রহণ করতেন। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক ছিল তাঁর ওয়াজ-নসীহত। আলিম-ওলামারা এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। ১৮৩টি ওয়াজ স্বয়ং ইমাম সাহেবের মাধ্যমে সংশোধন করিয়ে শেখ সাঈদ ইব্‌ন ফারেস ও আল্লামা ইব্‌ন লূবান 'মাজালিসে গাজ্জালী' নামে একটি ওয়াজ সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন।

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর বাগদাদ ত্যাগ ও নিঃসঙ্গতা অবলম্বন

তাঁর নিঃসঙ্গতা অবলম্বন এক বিস্ময়কর ঘটনা। নিজের রচিত 'মুনকেয মিনাদ দালাল' গ্রন্থে তিনি নিজেই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। কৈশোরে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এ মাযহাবের শিক্ষাই অর্জন করেছিলেন প্রথম জীবনে। তিনি বিভিন্ন মাযহাব ও ধর্মাধর্মের এক বিচিত্র

সমাবেশ দেখতে পেলেন বাগদাদে আসার পর। এক পর্যায়ে তিনি তাদের আচার-আচরণ ও শাসন অনুশাসন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। শিয়া, সুন্নী, মুতাযেলী, মজুসী, যিন্দীক, ইহুদী, খ্রিস্টান, আস্তিক, নাস্তিক, জড়বাদী, পৌত্তলিক, দার্শনীক যুক্তিবাদী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদের সমাবেশ ঘটার কারণে বাগদাদের মুসলিম সমাজেও বহু মতবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। বাগ্‌যুদ্ধের মাধ্যমে বিভিন্ন মতের পণ্ডিতরা প্রায়শ নিজ নিজ আকীদা বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। ইমাম সাহেবের জীবনেও আঘাত হানল এমনি বিভ্রান্তিকর অবস্থা। তাঁর জীবনের গতিপথকেই যেন পরিবর্তিত করে দিল।

ইমাম গাজ্জালী (র) এ সম্পর্কে বলেন– "শুরু হতে যেকোন বিষয়কে যাচাই করে দেখা আমার অভ্যাস। মাযহাবের প্রতিও আমার প্রাথমিক অটল আস্থা ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে গেল। শুনে শুনে যেসব বিশ্বাস আমার মানসপটে বাল্যকাল থেকে অঙ্কিত হয়েছিল, ধীরে ধীরে সেগুলো মুছে যেতে লাগল। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম। মনে হল, এ ধরনের অন্ধ বিশ্বাস তো ইহুদীরাও করে থাকে। সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না প্রকৃত জ্ঞানের মাঝে। যেমন– দশ সংখ্যাটি তিন সংখ্যার চেয়ে বেশী একথা ধ্রুব সত্য। যদি কোন লোক বলে, তিন দশ থেকে বেশী এবং তা প্রমাণ করার জন্য বলে যে, আমার হাতের লাঠিকে আমি সাপে পরিণত করতে পারি আর তা করে দেখিয়েও দেয় সে, তাহলে আমি বলব, লাঠি দিয়ে সাপ বানানো সত্যই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিন যে দশ অপেক্ষা বেশী নয় বরং কম সে বিশ্বাস অন্তরে থেকেই যাবে। এ বিশ্বাস কোন সীমা পর্যন্ত যেতে পারে– তখনই আমি ভাবতে লাগলাম।

জানতে পারলাম, তা প্রাথমিক এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানমাত্র। জ্ঞান পরিধি বাড়লে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও মতবাদের ব্যাপারে আমার সন্দেহ দেখা দিতে লাগল। এমনকি শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়েই আমার কোন দৃঢ় বিশ্বাস রইল না। দু'মাস সময় কেটে গেল এ অবস্থায়। আল্লাহর মেহেরবানীতে এ অবস্থা এক সময় অন্তর থেকে অপসারিত হতে লাগল। তবে মাযহাব সংক্রান্ত সংশয় থেকেই গেল। সে সময় বাগদাদে প্রধান দল ছিল চারটি। যুক্তিপন্থী, বাতেনী, দর্শনপন্থী ও সুফীবাদ। আমি প্রত্যেকটি দলের মতবাদ যাচাই করতে লাগলাম। যুক্তিশাস্ত্রের যত কিতাব সবই পড়লাম। কিন্তু তাতে মানসিক পরিতৃপ্তি হল না আমার। মাযহাবের কোন সম্পর্ক নেই

দর্শন শাস্ত্রের যা কিছু বিশ্বাসযোগ্য ছিল তার সাথে। আর যে অংশ মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিল অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী তাও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। ইমামদের প্রতি অন্ধভাবে যে দলটি বিশ্বাস পোষণ করত সমসাময়িক ভাবে সেটি ছিল বাতেনী দল। অথচ সমসাময়িক ইমামদের উপর কিভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়?

সুফীবাদ

ইমাম গাজ্জালী বলেন– সবশেষে সুফী মতবাদের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, শিবলী, বায়যীদ বোস্তামী প্রমুখ আওলিয়ায়ে কিরামের বই-পুস্তক পড়লাম। মহাত্মা আবূ তালেব মক্কী (র)-এর 'কুতুল কুলূব' ও মহাত্ম হারব মুহাসেবী (র)-এর বইগুলো অধ্যয়ন করলাম। তাতে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, একমাত্র সুফী মতবাদই যেন আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত; শুধু বাহ্যিক জ্ঞান দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া সম্ভব নয়। সঠিত আমলের জন্য প্রয়োজন পরিশ্রম ও ত্যাগ। আমি নিজের আমলের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, তা যথার্থ নিষ্ঠা ও খুলূসিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মন নাম যশের দিকে আকৃষ্ট হয় অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ফলে। অথচ এটি খুলূসিয়তের পরিপন্থী।

আমার অন্তরের যখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা, তখনই অজানা গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লাম। দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলাম ৪৪৮ হিজরী থেকে প্রায় ছ'মাস। এই দোদুল্যমানতার ভেতর থেকেই এক সময় কথা বলা থেমে যায়, শিক্ষাদান বন্ধ হয়ে পড়ে, আস্তে আস্তে হজম শক্তি শেষ হয়ে যেতে থাকে। চিকিৎসকরাও এ পরিস্থিতিতে চিকিৎসা নিষ্ফল বলে নিরাশ হয়ে হাত গুটিয়ে নেয়। অবশেষে আমি সফরে বেরিয়ে পড়ার দৃঢ় সংকল্প করি। বাগদাদের আলিম ওলামা ও শাহী কর্তৃপক্ষ এ সংবাদ জানতে পেরে নিতান্ত বিনয়ের সাথে বাধা দান করেন। সবাই দুঃখ করে বলেন, এটা ইসলামেরই দুর্ভাগ্য। এমন কল্যাণ কাজ বন্ধ করা আপনার পক্ষে শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয হতে পারে না। সমস্ত আলিম ওলামাই বলছিলেন; কিন্তু আসল বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফলে সবকিছু ছেড়ে হঠাৎ করে এক সময় সিরিয়ার পথে যাত্রা করলাম। শেষ পর্যন্ত সত্য সত্যই–

هیچ کارے گرچه صائب بے تأمل خوب نیست
بے تأمل استین افشاندن ازدنیا خوش است

উদাসীন অবস্থায় বাগদাদ ত্যাগ

ইব্ন খাল্লেকানের ভাষ্য অনুসারে ৪৮৮ হিজরীর যিলকদ মাসে ইমাম গাজ্জালী (র) বাগদাদ ত্যাগ করেন। তখন তাঁর অবস্থা ছিল নিতান্ত আবেগাকুল, উচ্ছ্বাসময় ও লৌকিকতাপূর্ণ। বাগদাদের মহামূল্য পোশাক আশাক ছেড়ে তখন তাঁর পরনে ছিল একটি মোটা কম্বল। সুস্বাদু খাদ্যের পরিবর্তে তখন তিনি শাক-সব্জী ভোজী।

বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, দীর্ঘ দিন থেকেই ইমাম সাহেব সংসার ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। কিন্তু সম্পর্কের বন্ধন শিথিল করতে পারেন নি। একদিন ওয়াজ করার সময় হঠাৎ করে তাঁরই ছোট ভাই ইমাম আহমদ গাজ্জালী এসে উপস্থিত হন এবং দু'টি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন ঃ

واصبحت تهدى ولا تهتدى * وتسمع وعظا ولا تسمع
فيا حجر الشجر حتى متى * تسن الحديد ولا تقطع

অর্থাৎ তুমি অন্যদেরকে হিদায়েত কর, কিন্তু নিজে হিদায়েত গ্রহণ করছ না। ওয়াজ শুনা কিন্তু নিজে শুন না।

হে পাষাণ পাথর! কাহাঁতক তুমি লোহাকে ধাতব করবে, কিন্তু নিজে কাটবে না।

এরপর আর দেরী করতে পারলেন না।

দামেশ্কে অবস্থান ও মুরাকাবা মুজাহাদা

বাগদাদ থেকে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সংসারত্যাগী দরবেশ ইমাম গাজ্জালী (র) রাজধানী দামেশকে পৌঁছে অবিলম্বে মুরাকাবা মুশাহাদা ও রিয়াযতে আত্মনিয়োগ কররেন। মসজিদে উমুবীর পশ্চিম মিনারে উঠে দরজা বন্ধ করে মুরাকাবা-মুশাহাদা ও যিকির আযকারে আত্মনিয়োগ করতেন নিয়মিত। ক্রমাগত দু'বছর দামেশকে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় মুরাকাবা মুশাহাদায় থাকলেও জ্ঞানচর্চার বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারেননি। জামে উমুবী ধরতে গেলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত চত্বরে বসে তিনি শিক্ষাদান করতেন।

শেখ ফারমাদীর হাতে বাইয়াত

ইমাম গাজ্জালী (র) নিজেই বলেছেন, 'নির্জনবাস এবং রিয়াযতের নিয়ম আমি তাসাউফের কিতাব থেকে শিখেছিলাম। কোন জ্ঞানই শুধু

কিতাবপত্র থেকে পুরোপুরি অর্জিত হয় না; বরং সেজন্য কোন বিজ্ঞজন শেখ তথা পীরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। সমস্ত ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম গাজ্জালী (র) শেখ আবূ আলী ফারমাদী এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন।

আলোচ্য শেখ ফারমাদী সমকালীন যুগে অতি উচ্চ পর্যায়ের একজন সুফী সাধক ছিলেন। তথাকার বাদর্শা তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যখনই শেখ ফারমাদী দরবারে আসতেন তিনি তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে সসম্মানে নিজের মসনদে বসাতেন এবং নিজে নিতান্ত ভক্তির সাথে সামনে বসে পড়তেন।

পক্ষান্তরে ইমামুল হারামাইন আবুল কাসেম কোশাইরীর সম্মানে তিনি দাঁড়ানো পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করতেন; নিজের আসন ত্যাগ করতেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে নিযামুল মূলক বলতেন, ইমামুল হারামাইন প্রমুখ এলে আমার সামনাসামনি আমার প্রশংসা করেন। কিন্তু শেখ আবূ আলী ফারমাদী আমার দোষত্রুটি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন এবং আমার হাতে প্রজাসাধারণ যাতে নির্যাতিত না হয় সে উপদেশ দান করেন। ৪৭৭ সালে বিজ্ঞজন শেখ আবূ আলী ফারমাদী ইমাম গাজ্জালী (র)-এর জন্মভূমি তুসে যখন ইন্তেকাল করেন, তখনই হয়ত তিনি মানসিকভাবে তাঁর হাতে ফকিরীর বাইয়াত নিয়ে ছিলেন। তখন ইমাম গাজ্জালী (র)-এর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর।

বায়তুল মুকাদ্দাসে পদার্পণ

দু'বছর অবস্থানের পর ইমাম গাজ্জালী (র) বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে দামেশক ত্যাগ করেন। আল্লামা যাবহতী ইমাম সাহেবের দামেশক ত্যাগ প্রসঙ্গে লেখেছেন– ইমাম দামাশক অবস্থানকালে একদিন মাদরাসা আমীনিয়ায় গমন করেন। মাদরাসার শিক্ষক ইমাম সাহেবকে সরাসরি চিনতেন না। শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে শিক্ষক মহোদয় বললেন যে, 'ইমাম গাজ্জালী এমনি বলেছেন।' কথাটি নিজের জন্য অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণ হতে পারে বলে ধারণা করে তিনি তখন দামেশক ত্যাগ করলেন। দামেশক থেকে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছান এবং সেখানেও সাখরার কোটরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রিয়াযত মুজাহাদায় মগ্ন হন।

হজ্জ ও যিয়ারত

বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান শেষে ইমাম গাজ্জালী (র) হযরত ঈসা (আ)-এর রওজা মুকামে খলীলে পৌঁছান। সেখান থেকে হজ্জের উদ্দেশে মক্কা মুকাররমা ও মীনা মানাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। দীর্ঘকাল মক্কায় অবস্থান করেন। এ সফরেই মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া সফর করেন এবং বেশ কিছু দিন আলেকজান্দ্রিয়ায় কাটান। ইব্ন খাল্লেকানের বর্ণনা অনুসারে এখান থেকে তাঁর ইউসুফ ইব্ন তাশকীনের সাথে সাক্ষাত করার জন্য মরক্কো যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ইতিমধ্যে ইউসূফ ইব্ন তাশকীনের ইন্তেকাল হয়ে যায়।

কোন কোন মনীষী এ বর্ণনার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ইমাম গাজ্জালী (র) যখন সংসার বিচ্ছিন্নই হয়ে থাকলে তখন কোন আমীর ওমরার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন কেন? কিন্তু তাদের এ সন্দেহ সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ইমাম সাহেব যে শান্তি-স্বস্তি ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপন করতে ইচ্ছাপোষণ করতেন, তা সেসব দেশে সম্ভব ছিল না বলে মরক্কো যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে থাকলে তাতে অবাক হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। যা হোক, দর্ঘি দশ বছর তিনি পবিত্র স্থানসমূহ ভ্রমণ করেন। অনেক সময় তিনি বিজন ভূমিতে বেরিয়ে পড়তেন এবং একাধারে চল্লিশ চল্লিশ দিন ধরে সেখানে অবস্থান করতেন। এ সব সফরের আকর্ষণীয় ঘটনাবলী খুব অল্পই জানা যায়। তবে যৎ সামান্য যা জানা যায় নিম্নে বর্ণনা করা হল।

সফরের কতিপয় ঘটনা

এক লোক একবার তাঁকে বিজন বিয়াবানে দেখে ফেলে। তখন তাঁর খিরকা পরনে ছিল, হাতে একটি পানির পাত্র। লোকটি তাঁকে ইতিপূর্বে মনোরম পোশাক-পরিচ্ছদে চার শতাধিক শিক্ষার্থীর পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় দেখেছিল। ইমাম গাজ্জালী (র)-এর এহেন ফকিরী অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, শিক্ষাদানের চাইতে কি এ অবস্থাটি ভাল? ইমাম সাহেব লোকটির প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দু'টি কবিতা পংক্তি পাঠ করলেন ঃ

ترکت هوے لیلی وسعدی بمنزل *
وعدت الى فصحوب اول منزل
ونادت بى الاشواق مهلا فهذه *
منازل من تهوى رويدك قانزل

অর্থ ঃ "আমি লায়লা আর সু'দার ভালবাস বিসর্জন দিয়েছি। ফিরে এসেছি আর প্রথম মানযিলে। আর এখনই আমার কামনাগুলো আমার ডেকে বলল, থামো! এইতো এটাই তোমার অভীষ্ট মানযিল।"

মকামে খলীলে ইমাম গাজ্জালী (র)

ইমাম সাহেব ৪৯৯ হিজরীতে যখন মকামে খলীলে পৌঁছান তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর রওজা তিনটি বিষয়ে মনে মনে সংকল্প করেছিলেন।

১. কোন বাদশাহর দরবারে যাব না।

২. কোন বাদশাহর কোন দান গ্রহণ করব না।

৩. কোন বাহাস-বিতর্কে অংশগ্রহণ করব না।

বস্তুত এরপর থেকে আজীবন তিনি এই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলতে থাকেন।

একদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের মাহদে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর যেখানে জন্ম হয়েছিল সেখানে উপনীত হন। কয়েকজন মহাপুরুষ– ইসমাঈল হাকেমী, ইবরাহীম শাবাকী, আবুল হাসান বসরী প্রমুখও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা দীর্ঘ সময় কাটান সেখানে। হঠাৎ ইমাম সাহেব আত্মবিস্মৃত অবস্থায় নিম্নের কাব্যাংশটি পাঠ করতে শুরু করেন ঃ

فديتك لولا الحب كنت فديتنى *
ولكن بسحر المقلتين سبيتنى
اتيتك لما ضاق صدرى عن الهدى *
ولو كنت تدرى كيف شوقى اتيننى

অর্থঃ তোমার তরে জীবন আমার উৎসর্গিত। আর যদি প্রেমই না থাকতো তাহলে উৎসর্গ হতে তুমি আমার জন্য। কিন্তু তোমার যাদুময় স্পর্শে মোহিত কর আমাকে। হৃদয়টি আমার যখন হিদায়াতের অভাবে সংকচিত হয়ে পড়েছিল; তখনই আমি তোমার সানিধ্যে এসেছি। আফসোস! তুমি যদি আমার ব্যাকুল অনুভব বুঝবেন!!

এ প্রেক্ষিতে আবুল হাসান বসরীর উপর আচ্ছন্নতা উপস্থিত হয় এবং তার প্রভাব অন্যদের উপরও পড়ে। এমনকি সবাই নিজেদের কাপড় ছিড়ে ফেলেন।

ইহ্ইয়াউল উলূম প্রণয়ন

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্ন আসীর লেখেছেন যে, ইমাম সাহেব এ সফরেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইহ্ইয়াউল উলূম রচনা করেন। হাজার হাজার আগ্রহী ব্যক্তি তাঁর কাছেই দামেশকে সেটি অধ্যয়ন করে। কোন কোন নাম করা ইতিহাসবিদ অবশ্য এ ঘটনার যথার্থতা সম্পর্কে এ কারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন যে, সফরে এ ধরনের গ্রন্থ কেমন করে প্রণয়ন করা যায়? সত্য সত্যই ইমাম গাজ্জালী (র) যে আত্মবিস্মৃতির অবস্থায় এ সফরে বের হয়েছিলেন, তাতে রচনা প্রণয়নের মত কঠিন বিষয় কল্পনা করা যায় না। কিন্তু অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধানে জানা গেছে, দশ বছরের সফরকালে তাঁর অবস্থা একই রকম থাকে নি। দীর্ঘ সময় তাঁর আত্মবিস্মৃতির অবস্থা থাকলেও বছরের পর বছর তিনি তরীকতের পথেও ছিলেন। আর সে সময় তিনি সব রকম লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। এ সফরেই তিনি 'কাওয়ায়েদুল ইতেকাদ' নামক পুস্তিকা বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের অনুরোধে রচনা কনে।

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর বিজ্ঞ শিষ্য বিখ্যাত পণ্ডিত, জনগণ কর্তৃক জামালুল ইসলাম খিতাবে ভূষিত আবুল হাসান ইব্ন মুসলিম এ সফরকালেই দামেশকে ইমাম সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইমাম সাহেব নিজেও 'মুনকেয মিনাদ দালাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, পরিবার-পরিজনের আকর্ষণ হজ্জ সম্পন্ন করার পর আমাকে স্বদেশে টেনে নিয়ে আসে। অথচ আমি স্বদেশের নামে বহু দূর-দূরান্তে পলায়ন করতাম। স্বদেশ পৌঁছে আমি নির্জনবাস অবলম্বন করি। কিন্তু জীবিকার অন্বেষণ এবং সময়ের চাহিদা আমার পরিচ্ছন্ন সময়কে কলুষিত করে দেয়, তাতে করে শান্তি ও স্বস্তির সময় অল্পই হাতে আসত। যা হোক, এই নিসঙ্গতার সময়েও ইমাম সাহেবের অবস্থা ছিল–

گهے بر طارم اعلى نشينم *
گهے بر پشت پائے خود نه بينم ـ

পুনরায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ

পূর্বে বলা হয়েছে, যে বিষয়টি ইমাম সাহেবকে বিজন ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা ছিল সত্যের সন্ধান আর বাস্তবতার যবনিকা উন্মোচনের উদ্দীপনা। ইমাম গাজ্জালী (র) বলেন, "রিয়াযত মুজাহাদা অন্তর এমন স্বচ্ছতা সৃষ্টি করে যে, অন্তরের সমস্ত পর্দা উঠে যায়। আর যেসব সন্দেহ সংশয়গুলো নিজে থেকেই দূর হয়ে যায়।" সত্যোন্মোচনের পর ইমাম সাহেব লক্ষ্য করলেন, ধর্মের দিক থেকে যুগ নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার মুকাবিলায়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের দম বন্ধ হয়ে আসছে। এসব দেখে নিঃসঙ্গতা থেকে আবারও বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করলেন। সৌভাগ্যক্রক্রে এ সময় সুলতানের পক্ষ হতে অধ্যাপনার কাজে পুনরায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ এসে আসে। আর নির্দেশটি এমন অনুরোধপূর্ণ ছিল যে, প্রত্যাখ্যান করা হলে বিরক্তির কারণ হতে পারত। তথাপি ইমাম সাহেব দ্বিধান্বিত ছিলেন। সলা পরামর্শ করলেন সুফী বন্ধু-বান্ধদের সাথে। সবাই নিঃসঙ্গতা পরিহারের পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ মতে ৪৯৯ হিজরীতে তিনি নিশাপুরের মাদরাসা নিযামিয়ায় অধ্যাপনার কাজে পুনরায় যোগদান করেন।

মাদরাসা নিযামিয়া থেকে পদত্যাগ

৫০০ হিজরীর মহররম মাসে এক বাতেনী আততায়ীর হাতে শহীদ হন ফখরুল মুলক। তাঁর শাহাদাতের সামান্য কিছুদিন পরেই সম্ভবত ইমাম সাহেবও মাদরাসা নিযামিয়ার অধ্যাপনা ত্যাগ করে পুনরায় নিজ মাতৃভূমি তুসে আসেন। একটি মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন নিজের বাড়ীর পাশেই। অতঃপর আমৃত্যু জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন সেখানে বসেই।

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর বিদ্বেষবাদী দল

যশ খ্যাতি বৃদ্ধির সাথে সাথে ইমাম সাহেবের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণের দলও ভারী হতে থাকে। বিশেষ করে ইমাম সাহেব ইহইয়াউল উলূম গ্রন্থে সমকালীন আলিম-ওলামাদের দোষ-ত্রুটি যেভাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, তাতে প্রায় অনেকেই তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একটি বিরাট দল তাঁর বিরোধিতায় লেগে গেল এবং প্রকাশ্যে তাঁকে অপমানিত করার পাঁয়তারা করতে সচেষ্ট রইল। তখন সেলজুক বংশির সাঞ্জার ইব্ন মালিক

খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। এ বংশটি হযরত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাজারের উপন গম্বুজ নির্মাণ করেছিল এ বংশের শাসকরাই।

ইমাম সাহেবের রিরোধিতা

ইমাম গাজ্জালী (র) তাঁর যৌবনে ফিকাহশাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে 'মনখুল' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি অতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীদের জন্য এটি ছিল এক মোক্ষম দলীল এবং ইমাম গাজ্জালী (র)-কে অপদস্ত করার উত্তম হাতিয়ার। এরা সাঞ্জাবের দরবারে এ গ্রন্থ নিয়ে হাজির হয় এবং তাতে অধিকতর রং চং লাগিয়ে বাদশার সামনে উপস্থাপন করে। তৎসঙ্গে ইমাম সাহেবের অন্যান্য রচনাবলীরও অপব্যাখ্যা করে দাবী করে যে, ইমাম গাজ্জালীর আকীদা বিশ্বাস ইসলামের খেলাফ।

সুলতান সাঞ্জাবের দরবারে ইমাম গাজ্জালী (র)-কে তলব

সুলতান সাঞ্জার নিজে শিক্ষিত ছিলেন না, যাতে করে ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মিংমাসা করতে পারেন। পাগড়ি আর এক শ্রেণীর আলখেল্লা ধারীরা যা বলছিল তাতেই তিনি বিশ্বাস করে বসলেন। ফলে তিনি ইমাম গাজ্জালী (র)-কে অবিলম্বে স্বীয় দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ জার করে দেন। ইমাম সাহেব কোন শাসনকর্তার দরবারে না যাবার অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন মকামে খলীলে দাঁড়িয়ে। সরকারী নির্দেশের সম্মান দানও ছিল খুব জরুরী। সুতরাং সাঞ্জারের নির্দেশ পেয়ে তিনি মাশহাদে রেযা তথা সেনানিবাস পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেলেন এবং সেখান থেকে সুলতানের উদ্দেশে ফার্সী ভাষায় এক পত্র লেখলেন– দরবার পর্যন্ত পৌঁছাতে নিজের অপরাকতার যথার্থ কারণ বিশ্লেষণ করে।

সাঞ্জারের দরবারে ইমাম গাজ্জালী (র)

পত্র পাঠ করে সুলতান সাঞ্জার ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাতের অধিকতর উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। সভাসদগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ইমাম সাহেবের সাথে সরাসরি কথা বলে তাঁর আকীদা বিশ্বাস ও মতামত সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বিরোধীরা সুলতানের এ অভিপ্রায় জানতে পেরে

ভীত হয়ে পড়ল, তাদের ধারণা সামনাসামনি হলে সুলতানকেও ইমাম সাহেব প্রভাবিত করে ফেলবেন। কাজেই তারা চেষ্টা করতে লাগল, যাতে ইমাম সাহেব দরবারে না পৌঁছে বরং নিজেরাই সেনানিবাস পর্যন্ত যেতে পারেন, যাতে বাহাস বিতর্কের ব্যবস্থা করা যায় এবং সেখানেই বিতর্কের মাধ্যমে তাঁকে কুপোকাত করে দেয়া যায়।

কিন্তু তুসের আলিম-ওলামাগণ এ সংবাদ পেয়ে সেনানিবাসে হাজির হয়ে বললেন, আমরা সবাই ইমাম সাহেবের শিষ্য। বিতর্কিত বিষয়গুলো আমাদের সামনে পেশ করা হোক। আমরা সেগুলোর যথাযথ সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে ইমাম সাহেবের শরণাপন্ন হবেন। আপনাদের ইমাম সাহেবের সাক্ষাত লাভের যোগ্যতা নেই। উভয় দলের বিতর্কের ফলে সুলতান সাঞ্জার ইমাম সাহেবকে সরাসরি সামনে রেখে ফয়সালা করাই সঙ্গত মনে করলেন এবং মন্ত্রী মুঈনুল মুলককে ইমাম সাহেবকে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম গাজ্জালী (র) অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেনানিবাসে এসে মন্ত্রী মুঈনুল মুলকের সাথে দেখা করলেন। মন্ত্রীবর তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং সাঞ্জারের দরবার পর্যন্ত তাঁর পিছে গমন করলেন। সাঞ্জার নিজেও ইমাম সাহেবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর সাথে কোলাকুলি করেন এবং শাহী মসনদে বসান। ইমাম সাহেব ইতিপূর্বে অনেক রাজা বাদশাহর দরবার দেখে থাকলেও সাঞ্জারের দরবারের আড়ম্বরই ছিল স্বতন্ত্র। তা দেখে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। সঙ্গে এক কারী সাহেব ছিলেন। তাঁকে কুরআনের কোন আয়াতে তিলাওয়াত করতে বললেন। তিনি اليس الله بكاف عبده আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। এতে তিনি অন্তরে শক্তি অনুভব করতে লাগলেন এবং সাঞ্জারের উদ্দেশ্য সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা দান করলেন, যা তাঁর 'মাততুবাতে' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কথাবার্তার শেষ পর্যায়ে বললেন, আমি দু'টি বিষয় নিবেদন করব।

১. তুসের লোকেরা আগেই নানা বিকৃত ব্যবস্থার দরুন উৎসন্য হয়েছিল। এখন শীত ও দুর্ভিক্ষের দরুন পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করবেন। আফসোসের বিষয়! মুসলমানদের গর্দান বিপদাপদে নুয়ে পড়ছে আর আপনার ঘোড়াগুলোর গর্দান নুয়ে পড়ছে সুবর্ণ রজত ভারে।

২. আমি গত বার বছর যাবত নির্জনবাসী। তারপরেও ফখরুল মুলক এখান পর্যন্ত আসতে বাধ্য করেছে। আমি বলছি, এ সময়টি এমনি যে, কোন লোক একটি সত্য কথা বললেই যুগকে যুগ তার শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু ফখরুল মুলক কোন কথাই শুনলেন না। বলেন, বাদশাহ বড়ই ন্যায়পরায়ণ, অন্যায় কোন বিষয় ঘটলে আমি নিজে বুক পেতে দিব।

আমি ইমাম আবু হানীফার প্রতি কটাক্ষ করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে যে কথাটি রটানো হয়, তা একান্তই ভুল। ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে আমার আকীদা তাই যা আমি ইহ্ইয়াউল উলূমে লেখেছি। আমি ফিকাহশাস্ত্রের তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী মনে কির।

সাঞ্জারের উপর ইমাম গাজ্জালী (র)-এর ভাষণের প্রভাব

ইমাম সাহেবের ভাষণ শুনে সাঞ্জার বলেন, আজ যদি ইরাক ও খোরাসানের সমস্ত আলিম-ওলামা এখানে উপস্থিত থাকতেন, তা হলে সবই আপনার এ ভাষণ শুনে উপকৃত হতে পারতেন। তারপরেও আমার অনুরোধ, বর্তমান পরিস্থিতি আপনি নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করে দিন যাতে সারা দেশে তা প্রচার করা যায়। এতে সবাই জানতে পারবে, আলিম ওলামাদের সম্পর্কে আমার বিশ্বাস কেমন। আমার বিশেষ আরজি আপনাকে আবারও অধ্যাপনার সেবা গ্রহণ করতে হবে। যে ফখরুল মুলক আপনাকে নিশাপুরে অবস্থানে বাধ্য করেছিল, সে ছিল আমার সামান্য এক কর্মচারী। এখন থেকে আমি নিজে নির্দেশ জারি করে দিব– যাতে সমস্ত আলিম ওলামারা বছরে একবার হলেও আপনার খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিবে।

ইমাম সাহেব নিজের মাতৃভূমি তুসে চলে যান বাদশাহ্র দরবার থেকে বিদায় নিয়ে। শহরের সমস্ত নাগরিক তাঁর অভ্যর্থনায় উপচে পড়ে। মানুষ আনন্দোৎসবের মাধ্যমে ইমাম গাজ্জালী (র)-এর চরণে মূল্যবান জওয়াহেরাত উৎসর্গ করে।

তারপরেও স্বার্থপর বিরুদ্ধাবাদীর নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকে নি। ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কার মাযহাব অনুসরণ করেন? ইমাম গাজ্জালী (র) বলেন, যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে যুক্তির, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে কুরআনের, ইমামদের ক্ষেত্রে কারো নয়। এ উত্তর শুনে বিরোধীরা চলে যায় এবং ইমাম সাহেবের কোন কোন রচনা এর বিরুদ্ধে

নানা রকম আপত্তি লেখে পাঠায়। ইমাম সাহেবও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সে সব প্রশ্নের উত্তর লেখে পাঠান। মোকাতাবাতে সে সব উত্তর যথাযথ উদ্ধৃত রয়েছে।

এ দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র প্রশমিত হয়ে গেলেও ইমাম সাহেবের যশ খ্যাতি তাদেরকে শান্তিতে নয় বরং গোত্রজ্বালার কারণ হয়ে রয়। সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন মালেক যখন ৫০০ হিজরীতে নিযামুল মুলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমদকে কেওয়ামুদ্দীন, নিযামুল মুলক, সদরুল ইসলাম খিতাবদান পূর্বক প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন, তখন তিনি আবারও ইমাম গাজ্জালী (র)-কে বাগদাদে আনার চেষ্টা চালান। বাগদাদের মাদরাসা নিযামিয়া তখন সমগ্র মুসলিম জাহানে ইসলামী বিদ্যা পীঠ হিসাবে স্বীকৃত। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ উচ্চতর শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশে এখানে আসত। সেই প্রেক্ষিতে শাসন কর্তৃপক্ষ এ বিদ্যাপীঠের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালাতে থাকতেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম সাহেব যখন মাদরাসা নিযামিয়া ত্যাগ করেন, তখন তাঁর ছোট ভাই ইমাম আহমদ গাজ্জালীকে নিজের নায়েব তথা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তা ছিল একটি সাময়িক ব্যবস্থা। ইমাম গাজ্জালী (র)-এর ফিরে আসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পরে স্থায়ী বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের বিকল্প কোথায় পাওয়া যেতে পারে? ফলে নিযামিয়ার পূর্ব প্রভাব আর বজায় থাকেনি।

আহমদ মন্ত্রিত্ব লাভ করার পর সর্বাগ্রে এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। তাছাড়া খলীফার নিজেরও এ ব্যাপারে লক্ষ্য ছিল। খোরাসানের অন্তর্গত তুস ছিল সুলতান সাঞ্জারের শাসনাধীনে। আর সদরুদ্দীন মোহাম্মদ ইব্‌ন মালেক ইব্‌ন নিযামুল মুলক ছিলেন সাঞ্জারের একজন মন্ত্রী। সুতরাং আহমদ অবিলম্বে সদরুদ্দীনকে একপত্র লেখলেন যাতে ইমাম গাজ্জালী (র)-কে পুনরায় মাদরাসা নিযামিয়ার অধ্যাপনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সঙ্গে ইমাম সাহেবকেও একপত্র লেখলেন তিনি। এটি বলতে গেলে একটি শাহী নির্দেশ ছিল। দরবারের সমস্ত সদস্য এতে স্বাক্ষর করেন।

আহমদ ইব্‌ন নিযামুল মুলক ইমাম গাজ্জালী (র)-কে যে পত্রটি লেখেছিলেন তার মর্ম– আপনি যেখানেই থাকবেন যদিও সেখানেই সাধারণ

মাদরাসা হয়ে যাবে, কিন্তু আপনি যেমন জাতির অনুসরণীয় আপনার অবস্থানও এমন শহরেই হওয়া উচিত, যেটি হবে সমগ্র ইসলামের কেন্দ্র। তাতে করে বিশ্বের সর্বস্থানের লোকজন সহজে যেগাযোগ করতে পারবে। বস্তুত এমন জায়গাটি হল– শুধুমাত্র দারুস সালাম বাগদাদ। অতএব আপনার মত বিজ্ঞ লোকের পক্ষে এখানেই থাকা উচিত, অন্য কোথাও নয়।

ইমাম গাজ্জালী (র)-এর বাগদাদে যাওয়া জন্য অপারগতা প্রকাশ

ইমাম সাহেব শাহী নির্দেশের উত্তরে সুদীর্ঘ পত্র লেখলেন এবং বাগদাদ গমনে অপারগতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করলেন।

১. এখন তুসে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে, বাগদাদে স্থানান্তর যাদের জন্য নিতান্ত কষ্টকর।

২. পূর্বে বাগদাদে ছিলাম, তখন আমার পরিবার পরিজন ছিল না। এখন সন্তানাদি ও পরিবার পরিজন রয়েছে, তাদের বাগদাদ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

৩. মকামে খলীলে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করেছি, আমি কখনও বাহাস বিতর্কে জড়াব না; অথচ বাগদাদে বাহাস-বিতর্ক ছাড়া কোন পথ নেই। তা ছাড়া খলীফার দরবারে সালাম করতে যেতে হবে, যা আমি পসন্দ করি না। সর্বোপরি আমি বেতন গ্রহণ করতে পারব না, অথচ আমার সংসার চলনোর মত কোন সম্পত্তিও বাগদাদে নেই।

যাই হোক, খিলাফত ও সালতানাতের পক্ষ হতে অনেক চেষ্টার পরও তুস ত্যাগ করলেন না এবং ইমাম সাহেব অধ্যাপনা গ্রহণে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন।

হাদীসের অধ্যয়ন সমাপ্তি

ইমাম গাজ্জালী (র) ছাত্র জীবনে হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেননি। শেষ বয়সে তা সমাপ্ত করে নিতে স্থির করলেন। সে সময় একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন– হাফিয ওমর ইব্‌ন আবুল হাসান যওয়াসী। ভাগ্যক্রমে তিনি তুসে আগমন করেন। আর ইমাম গাজ্জালী (র) তাঁকে নিজের মেহমান হিসাবে বরণ করে নিলেন এবং তাঁরই নিকট হতে

বুখারী ও মুসলিমের সনদ গ্রহণ করেন। হাফিয ইব্ন আসাকের এ প্রসঙ্গে লেখেন– সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করেছিলেন ইমাম গাজ্জালী আবু ইসমাঈল হাফ্সীর কাছে।

সর্বশেষ কিতাব রচনা

ইমাম গাজ্জালী (র) শেষ জীবনে পুরোপুরি দরবেশী অবলম্বন করেছিলেন এবং রাতদিন শুধু রিয়াযত মোজাহাদায় কাটাতেন, তথাপি রচনা গ্রন্থনার কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেননি। উসূলে ফিকাহর মধ্যে 'মুস্তাশফা' যা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের রচনা, তিনি ৫০৪ হিজরীতে সেটি প্রণয়ন করেন। 'মুস্তাশফা রচনার একবছর পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

পরলোকগমন

৫০৫ হিজরী ১৪ই জুমাদাসসানী তারিখে তাহেরান নামক স্থানে ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইব্ন জউযী তাঁর সমাধির বর্ণনা তাঁর ভাই ইমাম আহমদ গাজ্জালী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন–

সোমবার দিন ভোরে ইমাম সাহেব ঘুম থেকে উঠেন। ওযু করে নামায আদায় করেন এবং কাফনের কাপড় আনিয়ে চোখে মুখে ঘষে বলেন, মালিকের হুকুম শিরোধার্য। একথা বলেই পা লম্বা করে বিছিয়ে দেন এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই পরলোকে চলে যান।

ইমাম সাহেবের ইন্তিকালে সমগ্র ইসলামী জগত শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। অধিকাংশ কবি শোকগাঁথা রচনা করেন।

সন্তান সন্ততি

ইমাম সহেবের পুত্র সন্তান ছিল না। কয়েকজন কন্যা সন্তান ছিল। তাঁদের একজনের নাম সাত্তুল সিনা। তাঁর সন্তানদের বংশধারা সুদীর্ঘকাল অব্যহত থাকে। কাইয়্যুমী শেখ মজদুদ্দীন থেকে ইমাম সাহেবের উপাধি সংক্রান্ত একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাঁর কিতাবুল মিসবাহ গ্রন্থে। তাতে বলা হয়েছে যে, শেখ মজদুদ্দীন ষষ্ঠ পুরুষে সাত্তুল সিনার সন্তান ছিলেন এবং ৭১০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ছাত্র ও শিষ্য

ইমাম গাজ্জালী ছাত্র ও শিষ্যদের সংখ্যা ছিল অগণিত। স্বয়ং ইমাম সাহেব এক চিঠিতে সহস্রাধিক বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। তাশকীন বংশের আধিপত্য মিটিয়ে স্পেনে বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইব্ন তুমার্ত, আন্দালুসিয়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা আবু বকর আরবী প্রমুখ ইমাম সাহেবেরই শাগরেদ ছিলেন। ইমাম সাহেবের ছাত্র শাগরেদরা যেমন বিশ্বময় যশ-খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, তেমনি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীও কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবতার জন্য পথনির্দেশনার অবলম্বন হিসেবে শীর্ষস্থান দখল করে থাকবে।

প্রথম অধ্যায়

আলোর শ্রেণীভেদ

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র আলোর উৎস। এ ছাড়া অন্যদের বেলায় 'আলো' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাস্তব অর্থে নয়।

'আলো' শব্দটির তিনটি অর্থ রয়েছে। ১. সাধারণের কাছে, ২. বিশেষ লোকদের কাছে এবং ৩. বিশিষ্ট লোকদের কাছে। আবার এর ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার চরম আলো, পরম নূর। তিনিই সত্যিকার ও প্রকৃত একক জ্যোতি এবং অন্য কেউ এর শরীক নেই।

সাধারণের দৃষ্টিতে আলো

সাধারণের দৃষ্টিতে আলো মানে 'প্রকাশ' বা 'পরিদৃশ্যমান জগত'। আর প্রকাশ হচ্ছে– একটি সম্বন্ধযুক্ত ক্রিয়া। কেননা এখান প্রতিটি জিনিষ অপরটির কাছে প্রকাশিতও হয় আবার তা অপরটি হতে লুকায়িতও হয়। এতএব প্রকাশ ও গোপন উভয়ই সম্বদ্ধযুক্ত। সাধারণের কাছে পঞ্চইন্দ্রিওয়ের মধ্যে দৃষ্ট শক্তির সাথে এর নিকট সম্ভব রয়েছে।

সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বস্তুগুলো তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

১. যা দৃষ্টি গোচর হয় না, যথা– কালো বস্তু।

২. যা দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু তা দিয়ে অন্য কোন বস্তু দেখা যায় না। যেমন– উজ্জল বস্তু, নক্ষত্র, অনুজ্জল অগ্নি।

৩. যা দৃষ্টি গোচর হয় এবং তা দিয়ে অন্য বস্তুও দেখা যায়। যেমন– চন্দ্র, সূর্য, স্ফুলিঙ্গ; অগ্নি, প্রদীপ প্রভৃতি। এই তৃতীয় প্রকারই 'আলো' নামে অভিহিত।

কখনো কখনো উজ্জ্বল বস্ত হতে বস্তর উপর প্রতিফলিত আলোকে 'আলো' বলা হয়। যেমন– বলা হয়, পৃথিবী আলোকিত হয়েছে অথবা সূর্যালোক পৃথিবীকে উজ্জল করেছে। এ গুলোকে 'আলো' বলা হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে বস্ত দৃষ্টি গোচর হয় এবং তা দিয়ে অন্য বস্তও দেখা যায়, তাকেই 'আলো' বলে।

আলোর বৈশিষ্ট্য হলো– প্রকাশ ও দর্শন। আর এই প্রকাশ ও দর্শন নির্ভর করে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখের উপর। আলো প্রকাশ পেলে এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করলেও অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে তাতে কোনো উপকার হয় না। 'আলো' শব্দ দ্বারা প্রকৃত অর্থে আমরা আলো দেখার যন্ত্র চোখকেই বুঝি। এ কারণেই তত্ত্বানুসন্ধানীরা দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখের আলোকে 'আলো' বলে অভিহিত করেছেন। তাই চামচিকে সম্পর্কে বলা হয় যে, তার চোখের আলো ক্ষণি, দুর্বল। অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, তার চোখের আলো উবে গোছে! চোখের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে এবং তাকে সবল করে। মহান আল্লাহ্ বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চোখের চারধার বেষ্টন করে এবং আলোকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে।

চোখের সাদা অংশটি চোখের আলো বিক্ষিপ্ত করে, এতে করে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। ফলে সূর্যের তীব্র আলোর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়! যদিও একটা সাময়িক ব্যাপার, তবুও সকলের সামনে দুর্বলের নিস্তেজ হওয়ার একটা উদাহরণ।

উপরে উল্লেখিত আলোচনা হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখকেই 'আলো' বলা হয়। এখন প্রশ্ন এর নাম কেন 'আলো' হলো? এবং এ নামের কি সার্থকতা রয়েছে? এসব ধারণা বিশিষ্ট লোকদের কাছে সুস্পষ্ট। মারিফাতহীন লোকদের জন্য এ আলোচনা নয়।

দৃষ্টি শক্তির ত্রুটি-বিচুত্তি

চোখের আলোর কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। যেমন– চোখ অপরকে দেখতে পায়, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না। এভাবে ইহা অতি দূরবর্তী বস্ত এবং অতি নিকটবর্তী বস্ত দেখতে পায় না। অনুরূপ পর্দার অন্তরালের বস্তও দেখতে পায়, কিন্তু আভ্যন্তরীন ও অপ্রকাশ্য অংশ দেখতে পায় না। পরিদৃশ্যমান বস্তুর কোনটি দেখতে পায়, কোনটি দেখতে পায় না। ইহা সসীমকে দেখতে পায়, অসীমকে দেখতে পায় না। কখনো চোখ দর্শন করতে ভুলও করে! বড়কে ছোট ছোটকে বড়, দূরকে নিকট, স্থিরকে চলন্ত এবং গতি সম্পন্নকে স্থির বলে দর্শন করে। এ সব থেকে বুঝা যায় যে, চোখের আলোর উপরোক্ত সাতটি ত্রুটি রয়েছে।

উপরের আলোচনায় এটাই প্রমাণিত যে, মানুষের মনে পরিপূর্ণ গুণসম্পন্ন একটি চোখ রয়েছে, যাকে বোধশক্তি আধ্যাত্ম, মানবীয় আত্মা

বলা হয়। অর্থাৎ যে গুণ দ্বারা বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোককে দুধের শিশু, উমাদ ও চতুষ্পদ জানোয়ার হতে পৃথক করা যায়, তাকেই চোখ বলে। সর্বসম্মত পরিভাষায় এটা 'বুদ্ধি' বলে অভিহিত। আমি মনে করি প্রকাশ্য চোখের চাইতে বুদ্ধিকেই আলো বলা অত্যন্ত সমীচীন। কারণ, বুদ্ধি উপরে উল্লিখিত সাতটি দোষ হতে একেবারে মুক্ত।

মানুষের চোখ ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য

চোখ ও বুদ্ধির মধ্যে সাতটি পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তার বিশদ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

১. চোখ নিজেকে দেখতে পায় না। নিজের গুণেরও সে সম্যক জ্ঞান রাখে। বুদ্ধিতে জ্ঞান ও শক্তি অন্তর্নির্হিত রয়েছে। ইহা শুধু নিজের জ্ঞান সম্বন্ধেই সজাগ নয় বরং এর জ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান, এর জ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের জ্ঞান এভাবে অনেক দূরের জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন।

২. চোখ অতি নিকটবর্তী ও অতি দূরবর্তী বস্ত দেখিতে পায় না। কিন্তু বুদ্ধির কাছে 'নিকট দুর' সমান। ইহা চোখের নিমিষে আকাশে যেতে পারে আবার পাতালেও প্রবেশ করতে পারে। ইহা বস্তুর 'নিকট দুর' এর ধারে কাছেই শুধু নয় বরং সর্বত্র বিরাজমান। বুদ্ধি, বোধশক্তি, আল্লাহ্‌র মহাসমুদ্রের একটি মাত্র নমুনা। ইহা মুলবস্ত আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু সমান হতে পারে না। এ থেকে 'আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-কে আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।'

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ হাদীসটির অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। অর্থাৎ এখানে আদম (আ)-কে আল্লাহ্‌র আকৃতির সাদৃশ্য বলা হযেছে, সমান বলা হয়নি।

মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীসের صورته শব্দের মানে 'গুণ'। কেননা আল্লাহ্‌র কোন সুরত নেই। ব্যাকরণের দিক থেকে এখানে শব্দের সর্বনামটি নিকটে উল্লেখিত 'আদম' এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, দুরে বর্ণিত 'আল্লাহর'র দিকে নয়। হাদীসটির অর্থ দাঁড়াবে এই– 'আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে একক, অদ্বিতীয়। তাঁর মতো কোন সৃষ্টিই নেই।

৩. পর্দার আড়ালের বস্ত চোখ দেখতে পায় না। কিন্তু বোধশক্তি আকাশের অভ্যন্তর, ফিরেশতা জগত পর্যন্ত আপনজনের মতো পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে। তার সামনে যবনিকার

বেড়াজালের বস্ত পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। হাঁ, প্রতিকুল অবস্থার দরুন কখনো ইহা অকর্মণ্যও হয়ে পড়ে। যেমন– চোখ তার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে চোখের পলক বন্ধ করলে। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ পাবো।

৪. চোখ বস্তুর বাইরের ছাঁচ ও আকার দেখতে পায়, কিন্তু ভিতরের অংশ দেখতে পায় না। তা উপলব্ধি করতেও পারে না। অন্যদিকে, বুদ্ধি বাইরের ভিতরের সব কিছু দেখে পায়, বাস্তব উপলব্ধি করতে পারে, কার্য, কারণ বুঝে এবং তার নির্দেশনা দেয়। বস্তুটি কি থেকে সৃষ্টি, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, অসংখ্য অজানার সন্ধান দিতে পারে।

৫. চোখ কোন কোন সৃষ্ট বস্তু দেখতে পায়, কিন্তু সব ধরনের অনুভূতি থেকে সে বঞ্চিত। ইহা শব্দ, সুগন্ধি, স্বাদ, তাপ, শৈত্য এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে গন্ধ বুঝে না। চোখ আনন্দ, দুঃখ বেদনা, কষ্ট, শ্রম, প্রেম ভালবাসা, শক্তি, ইচ্ছা, জ্ঞান, মুর্খতা প্রভৃতি মানবিক অবস্থা আদৌ দেখতে পায় না। চোখের বিচরণ ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। অন্যদিকে বুদ্ধির রাজ্য বিশাল, বিস্তীর্ণ। তার বিচরণ ভূমি অনন্ত অসীম। সে সমগ্র সৃষ্ট বস্তু দেখতে পায়, উপলব্ধি করতে পারে। অন্তনিহিত অর্থ টেনে বের করতে পারে। এ দিকে সে একাই একশত।

বুদ্ধির উপলব্ধি চোখের চাইতে অনেক বেশী এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে এর রাজ্য অসীম নয় বরং সসীম। বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত, উচ্চতর জগত রূহ জগত, বুদ্ধি দেখতে পায় না। এ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান লোক ঐসব ব্যাপারে কিছু অভিমত পেশ করলেও তা সংশয়মুক্ত নয়। কারণ মানুষের বুদ্ধি বিভিন্ন ধরণের। তার নিজস্ব ধাঁচে চলে প্রতিটি বুদ্ধি। তাই বুদ্ধিই চূড়ান্ত একথা ঠিক নয়। তবে হাঁ, চোখের চাইতে বুদ্ধির বিচরণ অনেক বিস্তীর্ণ একথা সত্য।

আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, চোখ বুদ্ধির সমকক্ষ হতে পারে না। তাই তাকে 'আলো' বলা যায় না। অবশ্য অন্যদের তুলনায় ইহা একটি 'আলো'। কিন্তু বুদ্ধি তুলনায় ইহা একটি অন্ধকার। দৃষ্টিশক্তি হচ্ছে বুদ্ধির সংবাদ বাহনের অন্যতম। সে বুদ্ধির কাছে কেবল রূপ রংগেরই বার্তা বহন করে। বুদ্ধি তার ইচ্ছে মতো তাতে নির্দেশ প্রদান করে। এ ছাড়া কল্পনা, চিন্তা, স্মরণ স্মৃতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রবণ বুদ্ধির খাদিমের কাজ করে। বাদশা

যেমন– তাঁর ভৃত্যদের বন্দী করেন, বুদ্ধিও তেমনি এদের আটক করে। এর বিশদ বর্ণনা মৎ প্রণীত 'ইহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে 'আজায়িবুল কলব' অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

৬. চোখ অসীমকে দেখতে পায় না, বুদ্ধি তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। বুদ্ধি অজানা ভাবধারাকে নিকটে আনতে, তার উপর অজস্র চিন্তাধারা ফলাতে পারে এবং অসীমকে সে বুঝতে পারে। প্রকৃত কথা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অসীম নেই। অন্য কারো বেলায় অসীমত্বের কল্পনা করাও যায় না। তবুও বুদ্ধি যে অসীমকে জানতে পারে, তার মানে হচ্ছে মানবীয় বুদ্ধ যাকে সসীম মনে করে, কেবল সেই অসীমকে বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য যে, অঙ্কশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র, যা অসংখ্য সংখ্যা নিয়ে গঠিত। এক হতে বৃহত্তম সংখ্যার কোন সীমানা নেই। তাই তা অসীম। কিন্তু অঙ্কের আবিষ্কারক মানুষ হচ্ছে সসসীম। সুতরাং সসীমের আবিষ্কৃত সংখ্যা অসীম হতে পারে না, সসীম হতেই বাধ্য। মানুষের বুদ্ধির কাছে সংখ্যাগুলো অসীম হতেই বাধ্য। তবুও মানুষের বুদ্ধির কাছে ঐ সংখ্যাগুলো অসীম বলে তাকে অসীম আখ্যা দেয়া হয়েছে। দার্শনিকরা বলেন যে, প্রতিটি বস্তুর একটি সীমা আছে। আর না হোক একটি বুদ্ধি ভিত্তিক সীমা তো অবশ্যই আছে।

৭. চোখ বড় জিনিষকে ছোট ধারণা করে। সূর্যকে একটি ঢাল এবং নীলাকাশের বিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাজিকে রূপালী পয়সা বলে মনে করে কিন্তু বুদ্ধি জানে যে সূর্য ও নক্ষত্র পৃথিবীর তুলনায় অনেক গুন বড়। চোখ, তারা ও ছায়াকে অনড় দেখতে পায়, একটি বালককেও সে তাই দেখে। কিন্তু বুদ্ধি উপলব্ধি করে, বালক আরো বেড়ে চলেছে, ছায়া নড়ে চড়ে লম্বা হচ্ছে এবং তারা প্রতি মুহূর্তে বহু দূরে সরে যাচ্ছে।

এর সম্পর্কে একটি হাদীস আছে। মহানবী (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'সূর্য কি চলছে?' তিনি উত্তরে প্রথমে 'না' পরক্ষণেই হাঁ বলেছিলেন। এতে রাসূল করীম (সা) বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন জবাবের অর্থ কি? উত্তওর জিবরাঈল (আ) বলনেঃ 'আমার না হাঁ' বলা সময়ের মধ্যে সূর্য পাঁচশো বছরের পথ অতিক্রম করেছে।

চোখের অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু বুদ্ধির তা নেই। একথা সর্বতোভাবে স্বীকৃত বুদ্ধির ভুল-ত্রুটি নেই। কেননা যত রকম ভুল-ভ্রান্তি, পৃথিবীতে যত দুর্যোগ ও বিপর্যয় হচ্ছে তার মূলে রয়েছে অসৎ বুদ্ধির বিভ্রান্তি। একটি জিনিষকে উত্তম মনে করে অসৎ বুদ্ধি, অথচ সৎ বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখা যায় তা উত্তম নয়। অনুরূপ, এর ব্যতিক্রমও হয়। যা কুরআনের এ আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

عَسٰى اَنْ تُكْرَهُوْا شَيْـئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـئًا وَّهُوَ شَرٌّلَّكُمْ -

কখনো তোমরা কোন কিছুকে খারাপ মনে কর, অথচ তা তোমাদের জন্য মঙ্গল, আর কখনো তোমরা কোন কিছু পসন্দ করো, অথচ তা তোমাদের জন্য অমঙ্গলজনক।

এমনো দেখা যাচ্ছে যে কেউ অসৎ বুদ্ধি দিয়ে কোন একটি কাজের প্লান করলো, অথচ তা উৎসন্নে গেলো। অন্য দিকে কেউ সৎ বুদ্ধিতে কাজ করে সাফল্য অর্জন করলো। অনেক বুদ্ধিমান প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে, নিঃস্ব হচ্ছে। অনেক নির্বোধ ব্যক্তি আবার কোটিপতি হচ্ছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বুদ্ধিরই ভুল-ত্রুটি রয়েছে। অতএব এর উপর নির্ভর করা যায় না। তবে সৎ বুদ্ধির জয় সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে।

কেউ যদি এ প্রশ্ন তুলে, অনেক বুদ্ধিজীবি তাঁদের পদক্ষেপে ভুল করেন; তবে এর জবাবে বলা যায় যে, তাঁদের ধ্যান-ধারণা যখন বুদ্ধির সাথে যোগ দেয়, তখন তাঁরা মনে করেন যে, এটা বুদ্ধির কাজ। আসলে সেটা বুদ্ধির ফসল নয় বরং তা তাঁদের ধারণার ভুল। এর মধ্যে বুদ্ধিদাতার অদৃশ্য হস্ত বিদ্যমান। আমি 'জ্ঞানে মাপকাঠি ও বুদ্ধির দৌড়' নামক গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করেছি।

চিন্তা-ধারণা মুক্ত ভুল হতে পারে না প্রকৃত বুদ্ধিতে। তখন তা প্রকৃত অবস্থা অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তবে কল্পনা ও চিন্তামুক্ত বুদ্ধি বিরল, নেই বললেই চলে। মৃতুর পর পর্দা উন্মোচিত চোখের। বেরিয়ে পড়বে সব রহস্য। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাল-মন্দ সামনে হাজির দেখতে পাবে। নিজের কর্মফলও দৃষ্টি গোচর হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র ঘোষণা–

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰهَا -

ছোট বড় কোন কিছুই এ থেকে বাদ পড়বে না বরং সবই গণনা করা হয়েছে।

কিয়ামতের ময়দানে মানুষকে বলা হবে ঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

আমি তোমার চোখের আবরণ খুলে দিলাম। তাই আজ তোমার দৃষ্টি শক্তি প্রখর হলো।

কল্পনা বিলাসী ও অন্ধ বিশ্বাসী লোকেরা তখন বলে উঠবে– 'প্রভু! আমরা আপনার সব নির্দেশ মেনে নিচ্ছি। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। আমাদের আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিন। আমরা সৎকাজ করবো।

বুদ্ধির দর্শন এক নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন

বুদ্ধি সত্যিই অদৃশ্যকে দেখতে পায়। কিন্তু দৃষ্ট বস্তুগুলো একই স্তরের হয় না। কোন কোন জিনিষ সম্পর্কে তার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। যেমন– একই বস্তু প্রাচীন ও নবীন হতে পারে না। একই জিনিষ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব হতে পারে না। একই কথা সত্য ও মিথ্যা হতে পারে না। আবার যেখানে শব্দের বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় সেখানেই তার সাধারণ অর্থও পাওয়া যায়। এটাও জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। কালো কথাটি বললেই রংয়ের ধারণা আসে। মানুষ বললেই প্রাণীর ধারণা আসে। এসবও বুদ্ধির ক্ষেত্র। কিন্তু এর উল্টো দিকটা বুঝানো স্বাভাবিক নয়, মানে রং বললে শুধু কালোকেই বুঝায় না, প্রাণী বললে কেবল মানুষকেই বুঝায় না।

বুদ্ধি ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয় কোন কোন বিষয়ের সাথে। তখন একে জাগ্রত করতে হয়; লৌহার উপর আঘাত করে এর স্ফুলিঙ্গ বের করতে হয়। দার্শনিকদের কালাম দিয়ে উৎসাহিত করতে হয়। তখনই মানুষ আলোয় স্নান করে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে।

সাধারণভাবে আল্লাহ্র কালাম এবং বিশেষভাবে আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। পবিত্র কুরআনের আয়াতের সাথে বুদ্ধির তেমন সম্পর্ক, যেমন– সূর্যালোকের সাথে দৃষ্টি শক্তির সম্বন্ধ। এই সূর্যালোক দ্বারা দৃষ্টি শক্তির কাজ সাধিত হয়। তাই একে যেমন 'আলো' বলা হয়, কুরআনকেও সেরূপ যথার্থভাবে 'আলো' বলা হয়।

কুরআন হচ্ছে সূর্যালোকের মতো এবং বুদ্ধি হচ্ছে চোখের আলোর মতো। এটা হৃদয়ঙ্গম হলেই আল্লাহ্র নিম্নোক্ত কালামের অর্থ সহজে বুঝা যায়।

فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ـ

অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আমি যে আলো অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।

উপসংহারে

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, চোখ দু'ভাগে বিভক্ত– ১. বহির্চোখ ও ২. অন্তর্চোখ। প্রথমটি ইন্দ্রিয় জগত এবং দ্বিতীয়টি স্বর্গীয় জগতের সাথে সম্পৃক্ত। আবার চোখের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণতার মানষে প্রতিটি চোখের জন্য সূর্য ও আলো রয়েছে। সূর্যও দুটি। একটি প্রকাশ্য বা যাহেরী অন্যটি গোপনীয় বা বাতিনী। প্রকাশ্য সূর্য দেখা যায়, বাতেনী কুরআন ও আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী।

যদি পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় এ সব কথা, তাহলে স্বর্গ জগতের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সে জগতের আশ্চর্য দৃশ্যের কাছে এ জগতের যা কিছু তা নগণ্য তুচ্ছ। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় জগেতর ধার ধারে না, এই হীন ক্ষণ জগতের মায়া ও লোভ নিয়ে সদা ব্যস্ত, সে শুধু নরাধম পশুই নয়, পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট। কেননা, পশুকে তো স্বর্গীয় জগতের চিন্তা ও বিচরণ করার শক্তিই দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ـ

তারা পশুর মতো, তার চাইতেও পথভ্রষ্ট অধম এবং নিকৃষ্ট।

ফলের তুলনায় খোসা, আত্মার তুলনায় রূপ আকৃতি, আলোর তুলনায় আধার, উত্থানের তুলনায় পতন যেরূপ, স্বর্গীয় জগতকে আধ্যাত্মিক জগত, আলোর জগত ও উচ্চতর জগত বলা হয়। অপর দিকে নিম্নতর জগতকে বস্তুতান্ত্রিক জগত ও অন্ধকার জগত বলা হয়।

উচ্চতর জগত বলতে আমাদের মাথার উপর আকাশকে বুঝানো হয়নি। যদিও এ বস্তুতান্ত্রিক জগতের তুলনায় তা উচ্চে অবস্থান করছে। যখন এই পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে এই আকাশ অন্য আকাশে রূপান্তরিত

হবে, তখন মানুষের নিকট স্বর্গীয় জগতের দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং সে তখন স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত হবে। যা মানুষের চিন্তা-ভাবনার নিম্নস্তরে তা পৃথিবী, আর যা তার চিন্তাধারার উর্ধে বিদ্যমান, তা-ই তার কাছে আকাশ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায় এ পথে চলে, তার জন্যই এ পথটি হচ্ছে প্রথম মিরাজ।

মানুষ নিম্নতর জগতের অধম। আবার সে উচ্চতর জগতেও প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ্‌র সাথে ফিরেশতার সম্পর্ক রয়েছে বলে তারা স্বর্গীয় জগতের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্যই তাদের কেউ কেউ নিম্নতর জগতের দিকেও ধাবিত হয়। এ জন্যই নবী করীম (সা) বলেছেন–

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে আঁধারে সৃষ্টি করেন, অতপর তাতে আপন আলো জ্যোতি বিস্তার করেন।'

তিনি আরও বলেন– আল্লাহ্‌র এমন কতিপয় ফিরেশতা রয়েছে, যারা মানুষের কর্ম সম্পর্কে মানুষের নিজেদের চাইতেও বেশী ভালো জানে। নবীগণ স্বর্গীয় জগতে আরোহণ করতে পারেন এবং সেখান থেকে তাঁরা অদৃশ্য জগত দেখতে পান। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় জগতে আছেন, তিনি আল্লাহ্‌র অতি নিকটেই আছেন। তাই তিন অদৃশ্য জগত দেখতে পাচ্ছেন। স্বর্গীয় জগত হতেই এই পৃথিবীর সব কিছু বৃত্তের মতো ঘোরপাক খাচ্ছে। এ দুটি জগতের সম্পর্ক হচ্ছে– ছায়া-কায়া, ফল-ফলাধারী বৃক্ষ ও কারণ কর্তার মধ্যকার সম্পর্কের মতো। পৃথিবী হচ্ছে স্বর্গীয় জগতের বিমূর্ত প্রতিক। এ সম্পর্কে মিশকাত, মিছবাহ ও শাজারার আলোচনা দ্রষ্টব্য। যে এ সব আলোচনা বুঝতে পারবে, সে পবিত্র কুরআনের উপমা অতি সহজেই বুঝতে পারবে।

অনুধাবন করুণ

আমি বলছি 'যে বস্তু নিজেকে এবং অন্যকে দেখতে পায়' এ কথা না বলে বরং যে বস্তু অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে আলো বা উজ্জল প্রদীপ বলাই উত্তম। কেননা এর আলো অন্যের প্রতিও প্রতিফলিত হয়। রাসূল করীম (সা)-এর মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্য ছিলো, নবীগণ সবাই প্রদীপ। আলিমরাও তাই। তবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

লক্ষ্যনীয় বিষয়

দৃষ্টি শক্তির আলো যা থেকে বের হয়, তাকে যদি উজ্জল প্রদীপ বলা হয়, তাহলে যা থেকে ঐ প্রদীপ নিজে আলো প্রাপ্ত হয়, তাকে অগ্নি বলা

অধিক সমীচীন। এ পার্থিব প্রদীপ মূলত উচ্চতর আলোকরশ্মি থেকে আলোকিত। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র রূহ কখনো হঠাৎ উজ্জল হতো! অথচ তাতে অগ্নি স্পর্শ করতো না। যদি আগুন তা স্পর্শ করতো, তবে তো আর কথাই নেই দীপ্ত প্রদীপ্ত হতো। অতএব জাগতিক আলোর মুল উৎর্স হচ্ছে স্বর্গীয় আলো।

এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন– আল্লাহ পাকের সত্তর হাজার চেহারা বিশিষ্ট একজন ফিরেশতা আছেন। তাঁর সত্তর হাজার মুখ আছে প্রতিটি চেহারায় এবং সত্তর হাজার জিহ্বা রয়েছে প্রতিটি মুখে। যা দিয়ে তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। তিনি একাই সব ফিরেশতার মুকাবিলা করছেন। অন্যান্য ফিরেশতাদের সাথে এর মর্যাদার পার্থক্য দেখিয়ে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا -

যেদিন আত্মা ও ফিরেশতারা বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। এর শ্রেণীই হবে আলাদা। স্বর্গীয় আত্মাকে যদি জড় জগতের আলোর উপাদান বলে বিবেচনা করা হয়, তবে তাঁকে অগ্নির সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

তূর পর্বত ছাড়া সে আগুন দৃষ্টি গোচর হয় নি।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ফিরেশতা নবীগণের চাইতে উত্তম। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নবীগণ ফিরেশতাদের চেয়ে উত্তম। ইহা সর্বসম্মভাবে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অধিক জ্ঞানের জন্যই হযরত আদম (আ)-কে ফিরেশতাদের সেরা সাব্যস্ত করেছেন। পার্থিব প্রদীপ ফিরেশতাদের থেকে আলো গ্রহণ করে না। বরং সরাসরি তা আল্লাহ্‌র নূর গ্রহণ করে। অবশ্য কোন কোন সময় ফিরেশতারা নবীগণের কাছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন, এটা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। পৃথিবীর প্রদীপ স্বর্গীয় আলো থেকে আলোকিত হয়। যদি এক এক বস্তু, এক এক বস্তু থেকে আলোক প্রাপ্ত হয়, তা হলে প্রথম উৎসের যে অতি সন্নিকট হবে, তারই মূল্য বেশী। শ্রেণী ও ক্রমানুসারে সে-ই সর্বোচ্চ আলো।

নিম্নের দৃষ্টান্ত থেকে উপরে উল্লেখিত বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে– চাঁদের আলো জানালা দিয়ে ঘরের দেয়ালের আয়নায় পড়েছে। ঐ

আলোটিই আবার প্রতিবিম্বিত হয়ে সামনের দেয়ালে এবং তা আবার প্রতিফলিত হয়ে মেঝেতে। ফলে মেঝেও আলোকিত হয়েছে। মেঝের আলো দেয়ালের আলোর নিকট ঋণী, দেয়ালের আলো আয়নার আলোর নিকট, আয়নার আলো চাঁদের আলোর কাছে, আর চাঁদের আলো সূর্যের আলোর নিকট ঋণী। কেননা, সূর্য চাঁদের উপর আলো বিকীরণ করে থাকে। এখানে আলোর চারটি শ্রেণী ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। একটি আরেকটির চাইতে অধিক মহান ও পূর্ণ। প্রতিটির আলাদা স্থান ও স্তর আছে, যা তারা অতিক্রম করে না।

অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের কাছে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, স্বর্গীয় জগতের আলোক রশ্মিও এমনিভাবে সাজানো হয়েছে এবং সর্বোচ্চ আলোর কাছাকাছি সত্তাই সর্বোত্তম। এ থেকে বলা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ) এর চাইতেও হযরত ইসরাফীল (আ)-এর মর্যাদা বেশি। ফিরেশতাগণের মধ্যে তিনিই আলোর মূল উৎস, আল্লাহ্‌র অতি কাছে থাকেন। ফিরেশতাদের মধ্যে নগণ্য মর্যাদার অধিকারীও আছেন। কিয়ামতের দিন তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণীতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁদের মর্যদা অসংখ্য স্তরে বিভক্ত। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন–

وَمَا مِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ -

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ হয়নি আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে রয়েছি এবং আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন স্তরের আলো অসীম নয়। তারা একটি সর্বশেষ উৎসে পৌঁছে, যে উৎসটি নিজেই আলো। অপরের আলোয় যে উদ্ভাসিত নয়। সব আলো ক্রমানুসারে তাঁরই কাছ থেকে আলো পায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ যে বস্তুটি অন্য আলো দ্বারা আলোকিত হয়, সে প্রকৃত আলো আখ্যা পাবার যোগ্য, না যে আলো নিজেই স্বতঃ আলোকিত এবং যে অন্য সবাইকে আলো দান করে? এর প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। বাস্তবপক্ষে আলো নামটি সর্গীয় আলোরই প্রাপ্য, যার উপর কোন আলো নেই এবং যার নিকট থেকে অন্য সব জিনিষের উপর আলো ছড়িয়ে পড়ে।

মূল রহস্য

আমার বিশ্বাস আদি স্বর্গীয় আলো ছাড়া অন্য সব জিনিষকে আলো বলা উপমা মাত্র। কারণ এদের সবাই অসহায়। নিজস্ব কোন আলো নেই এদের। প্রত্যেকের আলো অপর সত্তা থেকে ধার করা, অন্য স্থান হতে সংগৃহীত। অতএব এদেরকে সত্যিকার অর্থে নয় উপমা হিসাবে আলো বলা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে পোষাক, অশ্ব জিন ধার করে, তারপর সে ঐ কাপড় পড়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে জিন কষে ধরে, তাহলে এই ব্যক্তি কি প্রকৃত পক্ষে ঐশ্বর্যশালী হবে, না উপমাচ্ছলে বলা হবে? একে ঐশ্বর্যশালী বলা কেবল উপমা স্থলেই যুক্তিযুক্ত। আসলে কিন্তু এ ব্যক্তি আগের মতোই দরিদ্র বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি ধার ফেরত নিতে পারে এবং যার নিকট হতে তা শুরু হয়েছিল, সেই ধার দাতাই হচ্ছে প্রকৃত ঐশ্বর্যশালী।

আমাদের বুঝতে হবে যে, মূলত আল্লাহ্‌ই হচ্ছে আলো। তাঁর পবিত্র হাতে আলোর সৃষ্টি ও পরিণতি। তিনি সর্বাগ্রে আলো দান করেন। এতে অন্য কেউ শরীক নেই। তবে কেবল শাব্দিক অর্থে শরীক আছে। একটি উদাহরণের সাহায্য নিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। সম্রাট, সামন্ত রাজাদেরকে উপাধি ও তাঁর জায়গীর দান করে থাকেন। সামন্ত রাজাদেরকে উপাধি ও তাঁর জায়গীর দান করে থাকেন। সামন্ত রাজা এ কথা সত্য বলে জানেন যে, তাঁর উপাধি ও জায়গীরের প্রকৃত মালিক তিনি নন, সম্রাট।

অনস্তিত্বের আঁধার হতে অধিক আর কোন আঁধার নেই। তাই যে আঁধার ছড়িয়ে দেয়, তাঁকে দু'চোখে দেখতে পায় না বলেই 'অন্ধকারাচ্ছন্নকারী' বলা হয়। আসলে তিনি নিজে বিলুপ্ত নন, সুপ্ত নন, জাগ্রত। তার যে সত্তা নিজে বিলুপ্ত, সুপ্ত, অন্যকে অস্তিত্বও দিতে পারে না, তাকে আঁধারই বলা যুক্তিযুক্তি। এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত সত্তা আল্লাহ্ এবং প্রকৃত আলো তিনিই।

আল্লাহ্‌কে আলো বলাও একটি উপমামাত্র। কেননা তিনি আলোর সৃষ্টি কর্তা। আলো হচ্ছে তাঁরই সৃষ্ট। অতএব স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্ত এক হতে পারে না। এটা মানুষকে বুঝার জন্য একটি উদাহরণ মাত্র। এ কারণেই অধিকাংশ কুরআন ভাষ্যকার 'নূর' মানে 'আলো দানকারী' বলেছেন।

গূঢ় সত্যের আসল সত্য

উপরের আলোচনা থেকে তত্ত্বাভিজ্ঞরা চাক্ষুস দেখছেন যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আদি অন্তে সবাই ধ্বংসশীল। যখন তার স্বকীয় সত্তায় কোন জিনিষকে বিবেচনা করা হয়, তখন দেখা যায় যে, এর কোনও অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব সব জিনিসে এসে পৌঁছে আদি সত্তা হতে। বিবেচনা করলে এ দিক দিয়ে একে বিদ্যমান বলা যায়। তবে এক্ষেত্রে যে অস্তিত্বে পৌঁছিয়েছে, তার সাথেই তাকে বিদ্যমান দেখা যাবে তবে এককভাবে নয়। অতএব আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই কেবল বিদ্যমান।

প্রতিটি জিনিষের দুটি শাখা রয়েছে। এক শাখা তাকে ঘিরে, অন্য শাখা আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধ নিয়ে। প্রথম দিকে তার অস্তিত্ব আছে। তাঁরই সাথে এর অস্তিত্বের সম্পর্ক, যিনি একে অস্তিত্ব দান করেছেন। অতএব অন্য কারোর অস্তিত্ব নেই একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া। তাঁর অস্তিত্বই একমাত্র অস্তিত্ব। সব জিনিষই ধীরে ধীর বিলীন হচ্ছে তিনি ছাড়া।

তত্ত্বজ্ঞান অনুসন্ধানীদের হাশরের দিনের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যেদিন আল্লাহ্ বলবেন–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ـ

আজ কার আধিপত্য? একমাত্র সর্বজয়ী আল্লাহ্‌র।

কারণ, এ আহবান তাঁদের কানে সারা জীবন এসেছে। আল্লাহ অন্যের তুলনায় বড় 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা তাঁরা মনে করেন না। তার অস্তিত্বের সীমানায়ও যেতে পারে না কোন অস্তিত্ব তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অতিক্রম করা তো দুরের কথা। অন্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের উপরই। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্তা থেকে বড় হবেন, তা অসম্ভব। তিনি এত মহান যে তুলনা বা সম্পর্কের দিক দিয়ে তাঁকে মহোত্তম বলা চলে না। তাঁর মহত্বের বাস্তব রূপ বুঝতে নবী বা ফিরেশতাও পারেন না। তিনি নিজে নিজেকে যেমন জানেন, বাস্তব জ্ঞানে অন্য কেউ তাঁকে তেমন জানে না। আমার 'কিতাবুল মূফাচ্ছেলাল আসমা ফি মায়ানিল আসমাউল হুসনা' গ্রন্থে এ দিকটা আমি আলোচনা করেছি।

এক সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই তত্ত্বজ্ঞানীরা উচ্চতর স্থানে পৌঁছে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে, আবার কেউ বা আত্মবোধ দ্বারা এ পথে পৌঁছেছেন। তাঁদের অধিকাংশই পরম একত্বের

মধ্যে নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছেন। স্বীয় বিবেক বুদ্ধি একত্বের অতল গভীরতায় ডুবিয়েছেন, একত্বের উন্মাদনায় বিভোর রয়েছে। আল্লাহ্‌র যিকর ছাড়া ঐ সময় তাঁদের মধ্যে আর কোন কিছু ছিল না। বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে তাঁদের কেউ أَنَا الْحَقُّ (আমি সত্য) বলে চিৎকার দিয়ে উঠেছেন। কেউ বা سُبْحَانِىْ مَا أَعْظَمُ شَانِىْ (আমি পবিত্র, আমার গৌরব কত বড়) বলেছেন। আবার কেউ مَا فِى الْجُبَّةِ اِلاَّ اللّٰهُ (আমার জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া কিছু নেই) বলেছেন।

যখন উন্মাদ ও নেশাগ্রস্ত হয়ে প্রভু প্রেমিকরা কথা বলেন, তখন নীরব শ্রোতা হওয়া কর্তব্য, তা প্রকাশ করা সমীচীন নয়। উন্মাদনা কেটে গেলে তাঁদের বিবেক ফিরার পর তাঁরা বুঝতে পারেন যে, একীভুতের এক সাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন মাত্র। আসলে তাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে একত্রীভূত হননি। এক আল্লাহ্ প্রেমিক প্রেমানুরাগে বলেন ঃ

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا نَحْنُ رَوْحَانِ حَلَّلْنَا بَدَنَا ـ

আমি যাকে চাই সেই আমি; যাকে চাই আমি সেই। দু'দেহাভ্যন্তরের রাস্তার পথিক আমরা।

জীবনে যে ব্যক্তি আয়না দেখেনি, হঠাৎ সে আয়না দেখলে তার মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি দেখে সে মনে করতে পারে যে, আয়নায় প্রতিফলিত ছবি আয়নারই ছবি। কাঁচের গ্লাসে মদ দেখে সে মনে করতে পারে যে, মদের রং গ্লাসের রং-এর অনুরূপ। প্রতিদিন এরূপ কল্পনা করলে সে এ চিন্তায় ডুবে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত বলে উঠবে–

رق الزجاج ورقت الخمره وقشبها فتشا كل الامره فكانما خمرو
لاقدح وكانما قدح ولاخمر ـ

গ্লাস সূক্ষ্ম মদও সূক্ষ্ম। মনে হয় সংঘাতময় কথা হয়েছে ঃ মদ আছে, পেয়ালা নেই; পেয়ালা আছে মদ নেই।

আল্লাহ্ প্রেমের উন্মাদনায় বিভোরকে 'নির্বান' বলে। আরোও ঊর্ধ্বে উঠলে তাকে 'নির্বাণের নির্বাণ' বলা হয়ে থাকে। কারণ, সে তার সত্তা থেকে এবং নির্বাপন হওয়া থেকেও নির্বাণ হয়েছে। সে নিজের সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল থাকে না এ সময়ে। অজ্ঞান অবস্থায় যদি সে নিজ অবস্থা

জানতে পারতো, তা হলে তো জ্ঞান ফিরতো। এরূপান্তরিত অবস্থাকে রূপক অর্থে 'একীভূত' বলা হয় এবং বাস্তব ভাষায় বলা হয় তাওহীদ। এ সকল সত্যের অন্তরালে অনেক এমন গূঢ় রহস্য রয়েছে, যার চিন্তা করা অবৈধ।

শেষ কথা

আপনারা সম্ভবত সেই সম্পর্কে জানতে চান, যে সম্পর্ক দিয়ে আল্লাহ্র আলো স্বর্গ মর্তের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং যে দিক থেকে তিনি স্বয়ং আকাশ পাতালের আলো। তিনিই একমাত্র আলো তা আপনার অবগত হয়েছেন। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন আলো নেই। আলোকরশ্মির উৎস তিনিই। আঁধারের আলো– আলোর আলো। এই আলো নিজে জ্বালায় নিজেই জ্বলে, আপনা থেকে আপনার জন্য। কোন উপাদান হতে সাহায্য নেয় না।

আলোয় স্বর্গ-মর্ত পরিপূর্ণ এবং দু'টি মৌলিক আলোক স্তরের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। এ দু'টি হলো– আমাদের দৃষ্টি ও অন্তদৃষ্টি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে বুঝি। আমরা আকাশে দেখি যে আলো, যথা– চন্দ্র, সূর্য, তারকা এবং আমরা পৃথিবীতে যা দেখি, যথা– সূর্য কিরণ যা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে, যা বিভিন্ন বর্ণ রংকে বিশেষ করে বস্তুকালকে দর্শনীয় করে তোলে; এবং যে সূর্যকিরণ পশু-পাখি, বন-জঙ্গল, পথ-ঘাট এক কথায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এসব বিকরণ ছাড়া কোনো রং দৃষ্টিগোচর হতো না এবং এদের সম্পর্কে ধারণা করাও সম্ভব হতো না। প্রথম আলোর স্তর 'দৃষ্টির বিবরণ' এগুলো।

অন্তদৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বিতীয় আলোক স্তরে স্বর্গীয় জগত পরিপূর্ণ। ঐগুলি-ফিরেশতা জাতীয় পদার্থ। নিম্ন স্তর জগতও এসব দিয়ে ভরপুর। অবশ্য এখানেমানবজীবন ও প্রাণীজীবনও রয়েছে। নিম্ন স্তর লোকের আলো দিয়ে নিম্ন স্তর জগতের বিধান চলে। অন্য দিকে স্বর্গীয় জগতের বিধান ফিরেশতার আলো দিয়ে চলে নিম্নের আয়াতে তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا -

তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদের মাটির পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِى الْاَرْضِ -

অবশ্যই তাদের তিনি পৃথিবীতে খলীফা মনোনীত করবেন।

وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ -

এবং তিনি তোমাদের পৃথিবীর প্রতিনিধি সৃষ্টি করবেন।

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً -

অবশ্যই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।

অনুভূতির বাহ্যিক আলো এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরীন আলোয় সমগ্র বিশ্বজগত ভরপুর। নিম্ন শ্রেণীর আলোগুলো একে অপরের সাহায্যে প্রজ্বলিত হয়। যেমন– প্রদীপ হতে আলো নির্গত হয়। প্রদীপ যেমন– তেল হতে আলো লাভ করে, আল্লাহ্ আলো থেকে তেমন নবুওয়াতের আলো প্রজ্বলিত হয়।

সকল আলোই এক মূল আলোর আলো। সকল আলোর উৎস ও মূল একক লা শরীক আল্লাহ। প্রকৃত আলো তিনিই। অন্যন্য আলো তাঁর নিকট থেকে নির্গত এবং তাঁর হতে ধার করা। অতএব তিনিই মূল। সকল মুখ মুখ তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পবিত্র কুরআন বলা হয়–

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ -

যে দিকে আল্লাহ রয়েছেন সেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে।

অন্য কোন উপাস্য নেই তিনি ছাড়া। ইবাদতের সময় সব ছেড়ে যার দিকে মুখ ফিরানো হয় উপাস্য তাকেই বলা হয় এবং যার অনুসরণ করা হয়। যিনি ব্যতীত অন্য কারো দিকে ইশারা ইঙ্গিত করা হয় না 'তিনি' বলতে তাঁকেই বুঝানো হয়। তাঁর দিকে ইশরা করা হবে যখনই ইশারা করা হয়। আমরা তাঁর রহস্য সম্পর্কে যদিও অজ্ঞ থাকি। যেমন কাউকে সূর্যকিরণ বুঝাতে বললে সে সূর্যকে দেখায়।

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّـٰهُ 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই' সাধারণ লোকের একত্ববাদের বাণী এবং لاَ هُوَ اِلاَّ هُـوَ 'না কিন্তু তিনিই' বিশেষ লোকের একত্ববাদের বাণী। আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই সাধারণ অর্থবোধক আর 'না কিন্তু তিনিই' বিশেষ অর্থবোধক। দ্বিতীয়টা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক বিষয়। যে মনেপ্রাণে এটা বিশ্বাস করে, সে ডুবে যায় চরম একত্বে।

এ পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়–

১. لا اله الا الله আল্লাহর নিজস্ব কালাম। অন্য কোন কালাম এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না। তবে অন্যটিকে উত্তম বলা অলীআল্লাহর বেলায় খাটে, অন্যদের বেলায় নয়।

২. لا اله الا الله ও لا اله الا هُوَ বলে আল্লাহ অবশ্য পার্থক্য করেছেন। সর্বসাধারণ লোকদের জন্য যে নির্দেশ, নবী-রাসূলদের জন্য সেই একই নির্দেশ নয় কিছু পার্থক্য আছে।

গ. 'লাহুয়া ইল্লাহুয়া' বাক্যটি শরীয়তে সমর্থিত।

মরণশীল মানুষের পরম লক্ষ্য চরম একত্বের রাজ্যে আরোহণ করা। ঐ মহান বাক্য ছাড়া এখানে আরোহণ করার অন্য কোন সোপান নেই। একমাত্র আল্লাহতে নিবেদিত প্রাণই উচ্চতর স্থানে পৌছিতে পারে সকল কিছু ছেড়ে। সেখানে উত্থান-পতন নেই। অবতরণকারী বা আরোহণকারী নেই। নেই বহুত্ব একত্বের সাথে। আর যেখান বহুত্ব বিলিন সেখানে গোপনেরও কোনে প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেথায় অবস্থার বিবর্তন নেই। তবে উত্থান হতে পতনের দিকে আগমনেই বির্তন ঘটে। কেননা উচ্চতর হতে যদিও আরো উচ্চতর নেই ঠিক, কিন্তু অবশ্যই আছে নিম্নতর। এটাই শেষ গন্তব্য স্থল আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের। তিনি তা জানেন এ সব যার কাছে পরিচিত। সে একে অস্বীকার করে যে অজ্ঞ। এ জ্ঞান সম্পর্কে অন্য কারো ধারণা নেই ওলামায়ে রাব্বানী ছাড়া। তাঁদের এ বক্তব্য অন্য কেউই অস্বীকার করে না মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া।

পৃথিবীর আকাশে ফিরেশতা নেমে আসেন তত্বজ্ঞানীরা বলেন। তাদের একজন কল্পনায় বিভোর হয়ে একটি বর্ণনা দিয়েছেন– "মহান আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন" তিনি আল্লাহর একত্বে ডুব দিয়ে বলেছেন। এ অবতরণ ইন্দ্রিয় পরিচালিত। এ সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ আছে ঃ

"আমি বান্দার শ্রবণশক্তি হয়েছি, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। তার দৃষ্টি শক্তি হয়েছি, যা দিয়ে দর্শন করে এবং তার জিহ্বা হয়েছি, যা দিয়ে সে কথা বলে।"

আল্লাহ যদি বান্দার শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি হন, তাহলে তিনিই একমাত্র শ্রোতা, দর্শক ও কথক। আরেকটি হাদীসে কুদসী ইঙ্গিত করে যা হযরত মূসা (আ)-কে বলা হয়েছে।

"আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি.... ।"

একত্ববাদের রাজ্যের সাতটি স্তর রয়েছে। এরপর বুদ্ধি উপবেশন করে একত্বের আরশে। আকাশের সর্বস্তরে নির্দেশ দেয় যেখান হতে। অধিকাংশ মানুষ বলে যে, আল্লাহ আপন আকৃতিতে আকদমকে সৃষ্টি করেছেন। কেহ 'আনাল হক' আবার কেহ 'আমি পবিত্র' বলেন। আল্লাহ বলেন– আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করো নি। আমি তার চোখ, কান, জিহ্বা হয়েছি। গভীরভাবে চিন্তা করলে এ সবের ভিন্ন মর্মার্থ রয়েছে।

আলোচনা দীর্ঘ করলে এ গুঢ় তত্ব আপনারা বুঝতে পারবেন না। এগুলো হচ্ছে জটিল আলোচনা। মানুষের বুদ্ধি সীমিত এ কারণে বোধগম্য নয়, দুর্বোধ্য। তাই আপনাদের বুঝার জন্য নীচে সহজ পন্থায় বিষয়টি উল্লেখ করিতেছি– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহ আকশা ও পৃথিবীর আলো" আয়াতটি পার্থিব দৃষ্টি গোচরীভূত আলোর সাথে তুলনা করে বুঝা যেতে পারে। যেমন– গাছে গাছে নতুন পাতা গজায় বসন্তের আগমনে আর ঘটে সবুজ রংয়ের সমাহার পাতায় পাতায়। তখন মনে হয় রং ছাড়া আর কিছু নেই। কোন কোন দর্শক তো এ সময় মনে করে যে, আলোর কোন অস্তিত্ব নেই। আর কিছু নেই রং ছাড়া রংয়ে। কিন্তু কি করে করা যায় আলোকে অস্বীকার? কারণ এরই মাধ্যমে আমরা সব জিনিষ দেখি। আলো নিজে অক্ষিগোচর হয় ও অন্য জিনিষকে দর্শায়। সূর্যাস্ত, প্রদীপ নিবে যাওয়ার এবং ছায়া তিরোহিত হওয়ার সময় দর্শন অন্তর্নিহিত ছায়া ও আলোর মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, তা স্বীকার করে। বাধ্য হয়ে তখন সে বলে যে রং ছাড়াই আলোর আলাদা অস্তিত্ব আছে। রংয়ের মধে তাকে অনুভব করা যায়।

অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ বহু জিনিষ দেখেন, আল্লাহকেও দেখেন। কেউ কেউ এদের থেকে একধাপ সামনে এগিয়ে বলেন–

'আমি প্রথমে আল্লাহকে না দেখে অন্য কোন জিনিষ দেখতে পাই না' কেউ আল্লাহর সাথে অন্য জিনিষ দেখেন। কেউ প্রথমে জিনিষ দেখেন, তারপর জিনিষের সাথে আল্লাহকে দেখেন।

প্রথমোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে এ আয়াত রয়েছে–

اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ -

তোমার প্রভু সব জিনিষের সাক্ষীর জন্য কি যথেষ্ট নন?

শেষোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে এ আয়াত রয়েছে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ -

আমি শীগগীরই তাদের আমার নিদর্শনাবলী দিগন্ত বলয়ে ও তাদের অন্তঃকরণে প্রদর্শিত করব।

প্রথম শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর প্রত্যক্ষ সঙ্গা আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তাঁর কাজ থেকেই তাঁকে ধারণা করে। প্রথম আল্লাহর দোস্তদের স্থান। দ্বিতীয় দৃঢ় বুদ্ধিমানদের। এ দু'শ্রেণী ছাড়া আর সবই গাফিল উদাসীন!

এখন আপনারা উপলব্ধি করছেন যে, আলোর জন্য প্রতিটি জিনিষ প্রত্যক্ষ গোচর হয়। আবার অন্তর্চক্ষুর নিকট যখন জিনিষ সুস্পষ্টরূপে ভেসে ওঠে, তখন আল্লাহর সাহায্যেই তা ভেসে ওঠে। অতএব, তিনি সবাইর সাথে সংযুক্ত রয়েছেন, বিমুক্ত নন। তাঁর কাছ থেকেই সব প্রকাশিত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়–আলোর অপসারণে আঁধার, আঁধারের তিরোধানে আলোর আবির্ভাব। ঐশি আলো নিভে না, কখনো অস্তমিত হয় না। এটা সব কিছুর সাথে বিরাজমান।

আল্লাহর অন্তর্ধান যদি সম্ভব হতো, তাহলে একাকার হয়ে যেতো আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত ধ্বংস হতো। কিন্তু তা না হয়ে বস্তু সব সময় একই আকারে দেখা দেয়। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ। সব সময় সর্বকালের জন্য সব জিনিষই তাঁর প্রশংসা করে। এতে চলার পথ গোপন থাকে এবং সৃষ্টির পার্থক্য দুর হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার বিপরীত সৃষ্টি থেকে জানা যায়। যার বিপরীত নেই, বিরুদ্ধে কিছু নেই; তাকে জানা বড় কঠিন। আল্লাহ পাক নিজেকে বেশী প্রকাশ করার কারণে সৃষ্টি থেকে গোপন রয়েছেন। তাঁর নিজের আলোর তীব্রতার জন্যই তিনি সব দৃষ্টি শক্তির বাইরে রয়েছেন। তিনি মহান, তিনি পবিত্র।

এ আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, মহান আল্লাহ কোন জিনিষের সাথে আবদ্ধ নন, বরং তিনি সব জিনিষের সাথে রয়েছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান স্থানের সাথে তাঁর সম্বন্ধ নেই। তিনি প্রতেক সৃষ্টি সত্তায় আছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে সকলের গোচরীভূত করেছেন।

চিন্তাশীল লোকদের মতে প্রকাশকারী সত্তা প্রকাশিত সৃষ্টি হতে দুরে থাকতে পারেন না। এ জন্যই বলা হয়, তিনি সর্ব সৃষ্টির সাথে আছেন। তাদের এ পথ পরিত্যাগ করাই উত্তম, যাদের এসব বুঝার ক্ষমতা ও সহনশীলতা নেই। কেননা, প্রতিটি জ্ঞানের জন্য বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। যে বিষয়ের জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে বিষয়ই তার জন্য সহজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুজাজাহ, মিশকাত, মিসবাহ প্রভৃতির ব্যাখ্যা

আলোচনাকে সহজ করার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়কে দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। এ দু'টি বিষয় আলোচনা ও বিবেচনার ক্ষেত্র যেহেতু সীমাহীন, তাই আমরা এখানে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করব মাত্র।

এ তুলনা বা উপমার রহস্য কি? অর্থকে তুলনা/উপমা হিসেবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যই বা কি? ইন্দ্রিয় জগত ও স্বর্গীয় জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের যথার্থতা কি? প্রভৃতি প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয় বস্তু।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানবিক রূহ এবং তার ক্রমোন্নতির স্তর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। আমরা পূর্বের বিষয়ের ব্যাখ্যা করার জন্যই পরবর্তী উপমা জগতের আলোচনা করে থাকি। কেননা, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর হাদীস–

مَثَلَ نُوْرِ فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكَوةٍ فِيْهَا -

মু'মিনের অন্তঃকরণে আল্লাহর নূরের উপমা এরূপ, যেমন– তার অন্তঃকরণে প্রদীপ কির'আতে।

হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (রা)-এর বর্ণনা–

مَثَلُ نُوْرِ قَلْبِ مَنْ اٰمَنَ كُمِشْكُوْةٍ فِيْهَا -

মু'মিনের অন্তঃকরণে নূরের উপমা প্রদীপের মতো, কিরআতে মু'মিনের অন্তঃকরণে আলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপমা ও উপমা নীতির রহস্য

জগৎ দু'প্রকার ঃ ১. স্বর্গীয়, ২. ইন্দ্রিয়, বা উর্ধজগত ও নিম্নজগত। এ দু'টোকে অনুভূতি ও প্রজ্ঞাভিত্তিকও বলা হয়। এ শব্দগুলো সমার্থবোধক। তবে ইবারত আলাদা। এদের সত্তা হিসেবে ধরা হলে ইন্দ্রিয় ও স্বর্গীয় হবে। আর চাক্ষুস হিসেবে ধরা হলে প্রজ্ঞা ও অনুভূতি ভিত্তিক হবে। আর একে অপরের তুলনা করা হলে তবে উচ্চতর ও নিম্নতর হবে। আবার কখনো এর একটিকে দৃশ্যমান মর্ত জগত এবং অন্যটিকে অদৃশ্যমান স্বর্গীয় জগতও বলে ধরা হয়। এর শব্দিক দিকে লক্ষ্য করা হলে ঘাবড়ে যাবার উপক্রম হবে। এর অর্থকে প্রধান এবং শব্দাবলীকে অপ্রধান মনে করে তত্বানুসন্ধানীরা। আর দুর্বল লোকেরা এর বিপরীত। শব্দ দ্বারা রহস্যোদঘাটন করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে তারা। আল্লাহ নির্মোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন এ দু'টি দল সম্পর্কে –

أَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

যে মুখ নীচু করে চলে, সে কি বেশি হিদায়েতপ্রাপ্ত, না যে সোজা পথে চলে?

উভয় জগতের অর্থ উপলব্ধি করার পর এটা জেনে নেয়া দরকার যে স্বর্গীয় ও উচ্চতর জগতকে অদৃশ্য জগত বলা হয়। কেননা, ইহা অদৃশ্য ও অবোধগম্য বহু লোকের কাছে। দৃশ্যমান জগত বলা হয় ইন্দ্রিয় জগতকে। কেননা, ইহা বোধগম্য সব লোকের কাছে।

বুদ্ধি জগতের সিঁড়ি হচ্ছে ইন্দ্রিয় জগত। ইন্দ্রিয় জগত হতে মানুষ বুদ্ধির জগতে আরোহণ করে। উভয় জগতের মধ্যে যোগাযোগ আছে। তা না হলে এ জগতে আরোহণের পথ বন্ধ হতো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভও অসম্ভব হতো। আল্লাহর সন্নিকটে কেউই যেতে পারতো না, যতক্ষণ না সে

পবিত্র জগতের বড় বড় ময়দান অতিক্রম করতো! ইন্দ্রিয় ও কল্পনা ছাড়িয়ে উচ্চতর জগতকে পবিত্র বলা হয়। যেখান থেকে কেউ বের হয় না এবং অপরিচিত কেউ ভিতরে প্রবেশ করে না। যাকে 'হাযীরাতুল কুদস' অর্থাৎ বেহেশত বলা হয়। আমরা পবিত্র আলোয় স্নাত মানুষের আত্মিক শক্তিকে অধিকাংশ সময় 'ওয়াদিল মুকাদ্দাস' বলে থাকি। 'হাযীরাত' শব্দটি বহু স্তরকে টেনে আনে। এ সব শব্দ অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের কাছে অবোধগম্য নয়। এখন এ শব্দমালার ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা আমাদের আলোচনা নয়। এখন এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করলে আমরা আমাদের মূল আলোচনা থেকে দূরে সরে পড়বো। তাই আসুন, আমরা শব্দার্থ রেখ মুল আলোচনা দিকে অগ্রসর হই।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, ইন্দ্রিয় জগত হচ্ছে স্বর্গীয় জগতের সিঁড়ি। এ উর্ধগতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে– সরল, ঋজু পথে চলা। ধর্ম বা হিদায়েতের মনযিল বলা হয় একে। উভয় জগতের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকলে, এক জগত হতে অন্য জগতের দিকে আরোহণ করার প্রয়োজন হতো না। আল্লাহ পাকের করুণায় ইন্দ্রিয় জগতকে স্বর্গীয় জগতের বিপরীত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই এ জড় জগতের এমন কোন সৃষ্টি নেই যা স্বর্গীয় জগতের কোন কিছুর প্রতীক বা উপমা নয়। সময় ভেদে এখানকার একটি সৃষ্টির স্বর্গীয় জগতের কয়েকটি সৃষ্টির উপমা হতে পারে। ঠিক তেমনি স্বর্গীয় জগতের একটি জিনিষ এ দৃশ্যমান জগতের অনেক জিনিষের উপমা হতে পারে। উপমা হয় দুয়ের মধ্যে কো না কোন পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই। এটার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ কাজ মানুসের সাধ্যের বাইরে। এ কাজের জন্য যথেষ্ট নয় মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন।

আমি বক্তব্য সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই। ফলে অল্প হতে বহুর প্রমাণ গড়ে উঠতে পারে। এভাবে রহস্য উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হবে আপনাদের সামনে।

ফিরেশতা বলে স্বর্গীয় জগতের জ্যোতিস্ক পদার্থকে। ঐ পদার্থ থেকে মানবিক রূহের উপর আলো বিচ্ছুরিত হয়। যার জন্য তাদেরকে 'রব্ব' বলা হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ হচ্ছেন 'রব্বুল আরবাব'।

আলো বিকিরণ পথের বিভিন্ন স্তর আছে। দৃশ্যমান জগতে জ্যোতিষ্ক আলোর উপমা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। প্রথমে নক্ষত্রের স্তরে পৌছে এ পথের

পথিক, তখন তার উপর আলোর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। সে এই তুলনাবিহীন সৌন্দর্য দেখে চিৎকার করে বলে ওঠে–

এই আমার প্রতিপালক– هٰذَا رَبِّىْ

অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ যাত্রী চাঁদ দেখতে পায়। তখন সে আগের অস্তমিত নক্ষত্রকে একটি কল্পনা মনে করে এবং বলে–

আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না– لاَ اُحِبُّ الاٰفِلِيْنَ

অবশেষে আরো সামনে এগিয়ে যেতে থাকে ঐ যাত্রী এবং এমন একস্থানে পৌঁছায়, যাকে সূর্যের সাথে তুলনা করা যায়, এখানে সে দেখে যে, তার চলারপথে সূর্য সব চাইতে বড়। জ্যোতিষ্ক পদার্থের মধ্যে তা বৃহত্তর। পূর্বের চাঁদ, তারার সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, তাও অস্ত যায়।

অসম্পূর্ণতা ও অস্তমিত হওয়া সাথে এর সম্বন্ধ আছে। সুতরাং সে মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলে ওঠে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

“নিশ্চয়ই আমি সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।”

বা “যিনি” এখানে একটি ফাঁকা কথা। কেউ প্রশ্ন করলে এর কোন জবাব দেয়া যায় না যে, এমন কি প্রতীক আছে, যা ‘যিনির সাথে উপমা দেয়া যেতে পারে? কারণ; আদি একক সত্তা আল্লাহর সকল সম্বন্ধের উর্ধ্বে। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ ‘আল্লাহর উপমা কি?’ এর জবাবে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

“আপনি বলুন, তিনিই এক আল্লাহ। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন না এবং জন্ম গ্রহণও করেন নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।”

তিনি যে সব উপমার উর্ধ্বে, অতুলনীয় উল্লেখিত সূরা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ কারণেই ফিরাউন যখন হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল–

وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

“বিশ্ব প্রভু কি?”

তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কার্য সম্বন্ধেই জবাব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

“যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভু।”

ফিরাউন এরূপ জবাব শুনে তার পরিষদদের বললো–

اَلاَ تَسْتَمِعُوْنَ ـ

“তোমরা কি লক্ষ্য করলে?” মূসা কিন্তু আল্লাহর আসল উমার বর্ণনা এগিয়ে গেলো। তখন হযরত মূসা (আ) বললেন–

رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

“তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রভু।”

ফিরাউন এখানে আল্লাহর উপমা জানতে চেয়েছিল কিন্তু বারবার আল্লাহর কার্যাবলী সম্বন্ধে জবাব দিচ্ছিলেন হযরত মূসা (আ)। ফলে ফিরাউন মূসা (আ)-কে উন্মাদ বলে প্রচারণা করে বললো–

اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ـ

“তোমাদের নিকট যে রাসূল পাঠানো হয়েছে, তিনি অবশ্যই বদ্ধ পাগল।”

স্বপ্নের তাবীরের মাধ্যম উপমা

নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ হচ্ছে স্বপ্ন। অতএব স্বপ্নে তাবীরের মাধ্যমে উপমা দেয়া যেতে পারে–

১. সূর্য দর্শনের স্বপ্নেনের তাবীর হচ্ছে রাজ দর্শন। এ দু’য়ের অন্তর্নিহিত অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য আছে। তা ছাড়া এ দু’টোই সবার উর্ধ্বে এবং এর আলোয় সবাই আলোকিত হচ্ছে।

২. চাঁদ-দর্শনের স্বপ্নেনের তাবীর হচ্ছে উযীর হওয়া। কেননা সূর্যাস্তের পর সূর্যালোক চাঁদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন রাজার অনুদান উযীরের মাধ্যমেই বহু দুরের প্রজাদের কাছে পৌঁছে।

৩. স্বপ্নে যদি কেহ দেখে যে তার কাছে সীল মোহর আছে, যা দিয়ে সে মানুষের মুখমণ্ডলে এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গে মোহরাঙ্কিত করছে; তাহলে এর তবীর হবে রমযান মাসে সুবহে সাদিকের আগে আযান দেয়া।

৪. স্বপ্নে যদি কেউ দেখে যে, সে জলপাই গাছে জলপাইয়ের তেল ঢালছে। তবে এর তাবীর হবে সে যে দাসীকে বিয়ে করছে সে তার মা অথচ সে তাকে চিনে না।

এভাবে উপমা পেশ করা সব ধরণের তাবীর দিয়ে আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই স্বর্গীয় জগতের আত্মিক বিষয়ের কতিপয় চন্দ্র-সূর্য তারকা দ্বারা উপমা দেয়া হলো। বাকীগুলোকে অন্যান্য উপমা দিয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে–

– আত্মিক জগতের কোন সৃষ্টি যদি স্থির, অপরিবর্তনীয়, বিরাট এবং মহান হয়, যা থেকে জ্ঞানের ঝরণা ধারা সজোরে হৃদয়ে উৎসারিত হয়, তার উদাহরণ তুর পর্বত হতে পারে।

– সেখানে যদি এমন কোন মহত্বের অধিকারী বস্ত থাকে, যার একটি অন্যটি হতে উত্তম, তবে তার উপমা হবে ডানের উপত্যকা।

– মহৎ গুণ মানব হৃদয়ে পৌঁছে এক হৃদয় হতে অন্য হৃদয়ে স্থানান্তরিত হলে উপমা হবে বামের উপত্যকা।

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ـ

– আমি আমার নির্দেশ দিয়ে রূহকে আপনার কাছে পাঠিয়েছি। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীর রূহ আল্লাহর প্রত্যাদেশের আলোকে উদ্ভাসিত। সুতরাং ঐ জ্বালানোর মূলের উপমা হবে অগ্নি।

– আগুনের মশালের সাথে উপমা দেয়া যায় নবীদের নিকট হতে প্রজ্ঞাবানদের মধ্যে যারা লোক পরম্পরা শ্রুত বর্ণনা মেনে চলে।

– আগুনের উত্তাপের সাথে উপমা দেয়া যেতে পারে যারা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও নবীদের বুদ্ধি পাওয়া যায়। কারণ, আগুনের সম্বন্ধ শুনে উত্তাপ পাওয়া যায় না। এর কাছে গেলে উত্তাপ পাওয়া যায়।

– নবীদের প্রথম জামাআত যদি ইন্দ্রিয় ও কল্পনার অধীনতা হতে পবিত্র জগতের দিকে উন্নীত হয়, তহলে তার উপমা হচ্ছে পবিত্র উপত্যকা। এক আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া এবং দু'জাহানকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত পবিত্র উপত্যকা অতিক্রম করা অসম্ভব।

ইহকাল ও পরকাল একে অপরের বিপরীত। কখনো ঐ দু'টোকে বর্জন করা আবার কখনো অর্জন করা সম্ভব। কা'বার দিকে ফিরার সময় জুতো খোলা, হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা হচ্ছে বর্জন করার উপমা! আমরা আল্লাহ দরবারে অগ্রসর হয়ে বলছি যে, এই দরবারে যদি এমন কিছু থাকে, যার দ্বারা বিভিন্ন বিজ্ঞান মানুষের হৃদয় ফলকে অঙ্কিত হয়, তাহলে তার উপমা হচ্ছে কলম।

এদের মধ্যে যদি এমন বস্তু হয়, যা অঙ্কিত জ্ঞানের সাথে মিলিত হতে পারে, তা হলে তাদের উপমা হচ্ছে ফলক, গ্রন্থ এবং উজ্জল সহীফা।

বিজ্ঞানের নকশার চাইতে বেশী যদি কোন বস্ত থাকে, যা তাকে বাধ্য করে কাজ করতে, তবে তার উপমা হচ্ছে হাত।

হাত, ফলক, কলম ও গ্রন্থ বিজড়িত দরবারের যদি কোন নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থাকে, তবে তার উপমা হচ্ছে আকৃতি, রূপ।

মনুষ্য আকৃতির অনুকরণে যদি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা অনুসারে গঠিত হয়, তাহলে এর ঐ রূপ আকৃতি হবে রাহমানের আকৃতি অনুসারে। আল্লাহর আকৃতি অনুসারে এবং রাহমানের আকৃতি অনুসারে কথা দু'টোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইলাহীর আকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত রহমতে ইলাহী ঐ আকৃতির সাথেই বিজড়িত।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর প্রতি তা প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে সমস্ত জগতের সর্ব প্রকার সংক্ষিপ্ত আকৃতি দান করেন। এক কথায় আদম হলেন এক সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর নমুনা। আদমের আকৃতি আল্লাহর আকৃতির লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তা অবশ্য আক্ষরিক ছিল না। কেননা, তাঁর লেখা বর্ণের উর্ধ্বে। আল্লাহর এ করুণা না হলে আদম সন্তান তাদের পালনকর্তাকে জানতে পারতো না। যে নিজেকে চিনেছে, সে তাঁর পালনকর্তাকে চিনেছে। রহমতের ঐ রূপ মর্মার্থ হওয়ায় আদম রহমানের আকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছেন, আল্লাহর আকৃতিতে নন।

ইলাহী, রহমান, মালিক, রব্ব এক নয়। এ জন্যই তিনি তাঁদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ ـ

"আপনি বলুন! আমি মানব জাতির প্রভু, মানবজাতির অধিপতি মানব জাতির ইলাহীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এমন অর্থ না হলে 'আল্লাহ তা'আলা আদমকে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।' অভিধানিক অর্থে সহীহ হাদীসটি ঠিক হতো না বরং 'আল্লাহ নিজ আকৃতিতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন।' বলা ঠিক হতো।

'মালিক' কে 'রব্ব' থেকে আলাদা করার জন্য বিস্তারিত আলোচনার দরকার। আমি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এ টুকুই আপনাদের জন্য যথেষ্ট। এ বিষয়টি একটি অকুল সাগর। কুল কিনারা পাওয়া কঠিন। উল্লেখিত আলোচনায় যদি আপনাদের কোন সংশয় থাকে, তবে আল্লাহর নিম্নোক্ত কালামের প্রতি লক্ষ্য করুন–

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ـ

"তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর নিজ নিজ পরিমাণ ধারণ করার জন্য নদী নালা রয়েছে।"

পরিশিষ্ট

উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত উপমা দ্বারা আমি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বর্জন করেছি আপনার এমনটা মনে করবেন না এবং আপনারাও ঐ অর্থকে বাতিল বলে মেনে নিবেন। আমি এটা বলতে পারি না যে, হযরত মূসা (আ)-এর কাছে জুতো ছিলো না এবং আল্লাহর বাণী– فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (জুতা খুল) তিনি শুনেন নি।

বাতিল পন্থীদের ধর্ম বাহিত্যকে অস্বীকার করা, যারা শুধু একটা দিক অর্থাৎ জগতের সমন্বয় সাধন সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না, এরূপ রহস্যকে পুরাপুরি অস্বীকার করা হলো জড়বাদীদের মত। অন্যকথায়, যে শুধু বাহ্যিককেই বিশ্বাস করে, সে-ই হলো অধ্যাত্মবাদী এবং যে ব্যক্তি এ দু'অবস্থাকে যোগ করতে পারে, সে-ই ব্যক্তিই হলো কামিল।

নবী করীম (সা) এ কারণেই বলেছেন–কুরআনের আদি-অন্ত, যাহির-বাতিন অর্থ আছে। এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি মনে করি যে, 'জুতো খোলো' এ নির্দেশটি হযরত মূসা (আ) আক্ষরিকভাবে জুতো খুলে পালন করেছিলেন আর উভয় জগতের সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন করে আধ্যত্মিকভাবে পালন করেছিলেন। এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। একটি হতে আর একটিতে অতিক্রম করা মানে বাহ্যজগত হতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করা।

এট অভিনব ব্যাখ্যা। আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণই এর মর্ম বুঝতে পারবেন। অন্যরা এর মর্মোদ্ধার করতে পারবে না।

এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর এই বাণী শুনলেন– "যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সেখানে ফিরেশতা প্রবেশ করে না।" তবু সেই ব্যক্তি কুকুর ঘরে রাখলেন এবং বললেন– এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ নেয়া যাবে না, বরং নবী করীমের কথার প্রকৃত অর্থ হলো ঃ অন্তরের ঘরকে ক্রোধের কুকুর থেক পরিষ্কার কর। কেননা, তা ফিরেশতাদের আলোর পথে বাধা জন্মায়।

অন্য একজন প্রথমত এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুসারে এ নির্দেশ পালন করেন এবং বলেন যে, কুকুর তার আকৃতির জন্য কুকুর নয় বরং বাতিনী দিক দিয়ে সে হিংস্র। ঐ ঘরকে যদি মানুষের দেহের বাসস্থান, বাহ্যিক কুকুর হতে মুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়, তবে মানুষের হৃদয় মনকে যা তার আসল সত্তার বাসস্থান, অধ্যাত্মিকভাবে কুকুরের হিংস্রতা হতে মুক্ত রাখার আরো বেশী প্রয়োজন।

যাহির-বাতিন উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি সমন্বয় সাধন করতে পারে, সে-ই কামিল। কামিল সেই ব্যক্তি, যার জ্ঞানের আলো তার ভক্তির আলোকে নির্বাপিত করে না। পূর্ণ আধ্যাত্মিক অন্তদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কামিল ব্যক্তি এ জন্যই শরীয়তের সামান্য আদেশ নিষেধকেও অবজ্ঞা করে না।

ক. কতিপয় তরীকা পন্থী শরীয়তের বাহ্যিক নিয়মাবলীকে গালিচার মতো ভাঁজ করে রাখে, এটা তাদের মারাত্মক ভুল।

খ. তাদের অনেকেই আবার নামায পড়া ছেড়ে দেয় এবং বলে– 'আমরা তো সর্বদাই বাতিনী নামায পড়ছি।

গ. আবার তাদের মধ্যে কেউ বলে, 'আমাদের কাজ কর্মে আল্লাহ তা'আলার কোনই প্রয়োজন নেই।'

ঘ. কারো কথা, 'মানুষের মন পাপে ভরা তাই তাকে পবিত্র রাখা সম্ভব নয় এবং কাম-ক্রোধের নির্মূল করারও প্রয়োজন নেই। কারণ, ঔগুলো ত্যাগ করার জন্য সে আর্দিষ্ট হয়নি বলে সে বিশ্বাস করে। এ সকল ধারণা মূলত মূর্খতা ও পদস্খলন মাত্র। শয়তান তাকে আত্ম অহঙ্কারের রশিতে আষ্টেপৃষ্টে বেধেছে।

আমরা এবার জুতোর ব্যাখ্যার দিকে যাই। জুতো খুলা মানে উভয় জাহানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা। আভ্যন্তরীণ সত্যের যোগাযোগ আছে

প্রতিটি বাহ্যিক সৃষ্টির সাথে। তাদের আত্মাই 'শিশার' স্তরে পৌঁছেছে যারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। উপমার উপাদান যোগায় যে কল্পনা, তা শক্ত, স্থূল এবং তা রহস্যকে লুকিয়ে রাখে। এটা আবরণ হয়ে দাঁড়ায় মানুষ ও আলোর মাঝে। তবে পরিষ্কার হলে শিশার মতো হয়। তখন তা আলোর মাঝে আবরণ হয়ে দাঁড়ায় না। বরং এরই আলোকে বাতাসের দ্বারা নির্বাপিত হওয়া হতে রক্ষা করে এবং এটা আলো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

কল্পনার স্থূল নিম্নজগত নবীদের কাছে শিশা, আলোর জন্য ক্ষুদ্র তাক, রহস্যের জন্য মুকুর এব উচ্চতর জগতের জন্য সিড়ি স্বরূপ। এ থেকে বুঝা যায় যে, যাহিরী উপমা ঠিক। এ পিছনে আছে গূঢ় রহস্য।

নবীদের দৃষ্টিশক্তি

নবী করীম (সা) বলেছেন যে, 'আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছি, তিনি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেন নি আপনারা এ ধারণা করবেন না। জাগ্রত অবস্থায় তিনি ইহা দেখেছিলেন যেমন একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পারে। যদিও ঐ সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) নিজ গৃহে ঘুমিয়ে থাকেন। মানুষের ঘুম ও অনুরূপ অবস্থার মধ্যে এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয়, কারণ তখন আত্মার উপর ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার প্রভাব থাকে না। ঘুম ইন্দ্রিয় আত্মাকে ব্যস্ত করে রাখে, তাকে ইন্দ্রিয় জগতে টেনে আনে, তার সত্তাকে অদৃশ্য এবং স্বর্গীয় জগত থেকে ফিরিয়ে আনে। কোন কোন নবুওয়াতী আলো এতো উজ্জল যে ইন্দ্রিয় তাকে নিজের রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করে না। কাজেই আলো যা স্বপ্নে দেখে, সে তা জাগ্রত অবস্থায়ই দেখতে পায়। সে অদৃশ্য আকার দেখার পথে সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে না যখন সে চরম পূর্ণতায় পৌছে বরং সেখান থেকে বর্তমান নিম্নতর জগতের দিকে টানবে।

আকর্ষণকারীর তুলনায় যদি জগত প্রভাবের দিকের আকর্ষণকারী অত্যাধিক শক্তিশালী হয়, তা হলে আত্মা বেহেশতের পথ থেকে ফিরে আসবে। আর বিশ্বাসের আকর্ষণ যদি অধিক শক্তি সম্পন্ন হয়, তাহলে এটা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করবে। অথবা তার ভ্রমণ পথ বেহেশতের দিকে এগিয়ে চলবে। দৃশ্যমান জগতে এর উদাহরণ হচ্ছে মেঘ। একইভাবে নবীদের রহস্য ধারনার আগেই প্রকাশিত হয়। আবদুর রহমানের বেলায়ই সীমাবদ্ধ নয় নবী করীম (সা)-এর রায়। যদিও তখন তিনি শুধু তাঁকেই দেখেছিলেন। যার দৃঢ়বিশ্বাস, আধ্যত্মিক দৃষ্টি প্রবল, এটা তার বেলায়ও সত্য। অবশ্য

তার বেশী ধন-সম্পদ থাকতে হবে। কারণ, বিশ্বাসকে কোনঠাসা করতে চায় অধিক সম্পদ। কিন্তু বিশ্বাসের জন্য তা পেরে ওঠে না।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যাবে যে, নবীগণ স্থূল জিনিষকে কিভাবে দেখতেন এবং স্থূল জিনিষ ছাড়া কিভাবে মর্মোদ্ধার করতেন। অধিকাংশ সময় প্রথমে ভাবকে তাদের দৃষ্টির কাছে উপস্থাপিত করা হতো। তৎপর সেখান থেকে তাঁরা ঐ ভাবকে কল্পনার শক্তিতে নিয়ে এবং ভাবানুযায়ী কতোগুলো স্থূল বিষয়ের ধারণা গ্রহণ করেন। জাগ্রত অবস্থায় ওহীর ঐ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন– ঘুমের স্বপ্নে তাবীরের প্রয়োজন। যদি ঘুমে এ সকল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তবে তা নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগের সমান হবে আর জাগ্রত অবস্থায় হলে, তাহলে তার মর্যাদা আরো বেশী হবে। আমার মতে জাগ্রত স্বপ্নের অংশ তিন ভাগের এক ভাগ। কেননা, নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য তিন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এর মধ্যে জাগ্রত স্বপ্ন একটি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলোকজ্জল মানব আত্মার স্তর

১। **ইন্দ্রিয়মূলক আত্মা ঃ** এটা ইন্দ্রিয় কর্তৃক আনীত সংবাদ গ্রহণ করে। এটা জীবাত্মার মূল। এটা দৃষ্ট হয় দুধের শিশুর মধ্যে।

২। **কল্পনামূলক আত্মা ঃ** ইন্দ্রিয় কর্তৃক আনীত সংবাদকে এ আত্মা লিখে রাখে এবং নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখে। প্রয়োজনবোধে প্রজ্ঞামূলক আত্মার নিকট পেশ করে। দুধের শিশুর রিকাশের প্রথম দিকে এ ভাব শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ জন্য শিশু কোন জিনিষকে দেখলে, তা পেতে চায়। কিন্তু জিনিষটি যখন তার নজরের বাইরে চলে যায়, তখন সে তা ভুলে যায় এবং তা পাওয়ার জন্য তার মন আকুলি বিকুলি করে না। আস্তে আস্তে যখন সে বড় হতে থাকে, তখন সে জিনিষটির জন্য কান্নাকাটি আরম্ভ করে এবং তা পেতে চায়। কারণ, এর ছবি তার কল্পনায় সুরক্ষিত হয়। কারো এ শক্তি আছে আর কারো আবার এ শক্তি নেই। পতঙ্গের মধ্যে এ শক্তি নেই বিধায় সে আগুনে পুড়ে মরে। সূর্যালোকের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ, তাই সে আগুনের ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রদীপকে সে সূর্য কিরণের একটি প্রশস্ত জানালা মনে করে। তাই ক্ষিপ্রতার সাথে সে আগুনের দিকে ধাবিত হয়, কষ্ট পায় পরিশেষে মরে যায়। যদি সে আগুন অতিক্রম করে আধারে প্রবেশ করে, তাহলেও বার বার আলোর দিকে ফিরে আসে। যদি পূর্বের ব্যথা তার স্মৃতিতে জাগরুক থাকতো, তবে সে আর আগুনের দিক ফিরে আসতো না। অন্যদিকে কুকুরকে একবার ছড়ি দিয়ে মারলে সে পরের বার ছড়ি দেখেই দ্রুত পালায়।

৩। **প্রজ্ঞামূলক আত্মা ঃ** ইন্দ্রিয় ও কল্পনাকে এড়িয়ে ভাব বুঝার আত্মা হলো প্রজ্ঞামূলক আত্মা। এটা মনুষ্য সুলভ গুণ। ইহা পশু ও শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এর ধারণা অবশ্যম্ভাবী ও বিশ্বজনীন। বুদ্ধির আলোকে যেখানে চোখের দৃষ্টি শক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, সেখানে এ বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

৪। **চিন্তামূলক আত্মা ঃ** ইহা শুধু প্রজ্ঞাভিত্তিক বিষয়াদি গ্রহণ করে তাদের একত্র করে এবং পারস্পরিক আত্মিক পরিচিতি সৃষ্টি করে। যদি এতে দুটো ফল বের হয়, তবে আবার তাদের একত্র করে এবং সঠিক ফল বের করে এবং তা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৫। **নবুওয়াতমূলক আত্মা ঃ** এ জাতীয় আত্মা নবী ও কতিপয় ওলীর সাথে জড়িত। অদৃশ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরকালীন বিধানাবলী এবং স্বর্গ-মর্ত্যের সব জ্ঞান তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তৃতীয় চতুর্থ প্রকার আত্মা আল্লাহ প্রদত্ত কোন কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝতে পারে না।

পবিত্র কুরআন পাকের আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

"এমনিভাবে আমি আপনার কাছে আমার নির্দেশসহ রূহ পাঠিয়েছি। তা নাহলে আপনি জানতেন না যে কিতাব ও ঈমান কি? কিন্তু আমি ঐগুলো আলোস্বরূপ করেছি, যার সাহায্যে আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে সৎপথ প্রদর্শন করি এবং অবশ্যই আপনি সোজা পথ প্রদর্শন করেন।"

আরো একটি স্তর থাকা অসম্ভব নয় বুদ্ধির উপর, যার উপর এমন বস্তু প্রকট হয়, যা বুদ্ধির স্তরে প্রকাশ পায় না। চরম পূর্ণতা সকলেই বুঝতে পারে না। কোন কোন মানুষের বৈশিষ্ট্য এটা। কবিতার উল্লেখ করা যেত পারে উদাহরণ স্বরূপ। কবিতায় পারদর্শী একদল লোক। অপর দিকে অনেকেই কবিতার ছন্দ, গতি, মর্ম, লয়' ভাব দ্যোতনা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। কোন কোন লোক সুন্দর সুর মুর্ছনা, গীতি কাব্য গান রচনা করতে পারে। তারা এ সবের একচেটিয়া অধিকারী। তারা এ সকল সুর মুর্ছনা সৃষ্টি করে মানুষের মনে হাসি-কান্নার সান্তনা, উন্মাদনা, আনন্দ-উচ্ছাসের উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু এ সবের প্রতি যার ঝোঁক ও প্রবণতা নেই, সে সুর শুনে সত্যি; তবে এতে তার মনে মাদকতা সৃষ্টি করে না। গানে মাতোওয়ারা ও সুরে উন্মাদ লোককে দেখে সে বিস্ময়বোধ করে এবং হাসে। এ পথের সব বিশেষজ্ঞরা তাকে রাগিনীর তত্ত্বজ্ঞান বুঝালেও সে বুঝবে না। ইহা আপনাদের উপলব্ধির জন্য একটা সাধারণ উদাহরণ। আপনিও নবুওয়াত মূলক আত্মার শামিল হয়ে যান। ওলীদের নবুওয়াত মুলক আত্মার অনেকটা দান করা হয়েছে। আপনি নিজে উপরোক্ত উপমা অনুধাবন করুন এবং জ্ঞানীদের দলভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে কমপক্ষে ঈমান আনুন। কেননা পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে–

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ এবং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।"

জ্ঞান ঈমানের চেয়ে, গূঢ় রহস্যের অভিজ্ঞতা জ্ঞানের অভিজ্ঞতার চেয়ে বড়। বাস্তব যুক্তি প্রমাণের নাম জ্ঞান এবং পূর্বপুরুষের মত শুধু মেনে চলা ও গূঢ় রহস্যের অধিকারীর প্রতি উত্তম মনোভাব পোষণ করার নাম ঈমান।

উল্লেখিত পাঁচ প্রকার মানবিক আত্মাই হচ্ছে আলো। সব ধরণের অস্তিত্বশীল বস্তু প্রকাশিত হয় এদের সাহায্যেই। যদিও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও কল্পনাপ্রসূত বস্তু পশুর মধ্যে পাওয়া যায় তবুও এর উন্নত অংশ মানুষের মধ্যেও পাওয়া যায়। মানুষের জন্য এটা আদর্শের বিশেষ ধারণা নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জীবিকা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পশুর জন্যও সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের অনুগত থাকার জন্যও ঐ দু'টো পশুর নিমিত্ত সৃষ্টি হয়েছে। ঐ দু'টোর উপর মানুষ সওয়ার হয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। সে একজন নির্দিষ্ট লোককে চিনতে পারলে সাধারণভাবে বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে চিনতে ও জানতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভাব বোধগম্য করত পারে। এ বিষয়ে আমরা আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি।

আয়াতের উপমা

মানুষের পঞ্চশক্তি তাক, কাঁচ, প্রদীপ, বৃক্ষ, তেল এই পাঁচটি জিনিষ সম্বন্ধে যথেষ্ঠ ব্যাখ্যা রয়েছে। আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনার করবো।

১। ইন্দ্রিয় শক্তি ঃ যদি আপনারা ইন্দ্রিয় শক্তির দিকে তাকান তাহলে দু'চোখ, দু'কান, দু'নাক থেকে এর আলো আসে বলে মনে করবেন। অভিজ্ঞতার জগতে এর উপযুক্ত উপমা হচ্ছে 'তাক'।

২। তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে কল্পনা শক্তির ঃ

ক. বস্তু জগতের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক আছে। এর জন্য পরিমাণ, আকার গঠন ও নির্দিষ্ট দিক রয়েছে। চিন্তাশীল লোকদের তুলনায় দূর নিকট হয়ে থাকে। দৈহিক গুণ বিশিষ্ট স্থুল জিনিষগুলো খাঁটি বুদ্ধির আলোর নিকট অস্পষ্ট।

খ. এই স্থুল জিনিষগুলো পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, মজবুত হলে বুদ্ধির ভাবের সাথে সাদৃশ্য লাভ করে এবং তার নিকট হতে আগত আলোর কাছে স্বচ্ছ হবে।

গ. কল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে চরম পরমুখাপেক্ষী থাকে। এতে সে বুদ্ধিগত জ্ঞান সংরক্ষণ করতে পারে, যার ফলে ঐ জ্ঞান বিশৃংখল হতে পারে না বরং কল্পনালব্ধ জ্ঞানকে এক সাথে রক্ষা করে।

আপনারা দৃশ্যমান জগতের দর্শকের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পান। ইহা কাঁচ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কেননা, কাঁচ যদিও স্থুল, তা সত্বেও ইহা স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম। ফলে এটা প্রদীপের আলোকে বাইরে পৌঁছে দেয়, পর্দা করে রাখে না। তাছাড়া অত্যন্ত ঝাঁকানী ও প্রবল বাতাস হতে আলোকে রক্ষা করে।

৩। বুদ্ধিশক্তি ঃ এর দ্বারা ঐশী ভাবমূলক জ্ঞান লাভ করা হয়। উপমার কারণ আপনাদের জানা আছে। পূর্বে 'নবীদের প্রদীপ উজ্জল' আলোচনায় এ বিষয়টি অবগত করা হয়েছে।

৪। চিন্তাশক্তি ঃ এর বিশেষত্ব এই যে, একটি শিকড় হতে শুরু করে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়। অতঃপর দু'টি করে প্রশাখা বের হয় প্রতিটি শাখা হতে। এমনিভাবে অনেক শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হয়ে একটি নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছে। অতঃপর এটা সমপর্যায়ের বেলায় মধ্যস্থতার কাজ করে। আমাদের পৃথিবীতে এর উপমা জলপাই গাছ ছাড়া নাশপাতি, ছেব, ডালিম প্রভৃতি অন্য কোন গাছ দ্বারা দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, জলপাই ফলের মূল হচ্ছে তেল, যা দিয়ে প্রদীপ জ্বলে। সব তেলের চেয়ে এ তেল অত্যন্ত উজ্জল, অসংখ্য ফল ধরে এ গাছে। অতএব একে 'বরকতময় বৃক্ষ' বলা হয়। খাটি বুদ্ধিগত চিন্তার শাখা-প্রশাখা, দিক ও দূরত্বের সম্বন্ধ নেই। তাই একে 'পূর্বমুখীও নয়, পশ্চিম মুখীও নয়' বলা সঠিক হয়েছে।

৫। নবুওয়াতী পবিত্র শক্তি ঃ ইহা প্রোজ্জল ও স্বচ্ছ শর্ত সাপেক্ষে ওলীদেরও শক্তি। চিন্তাশক্তি, তালিম ও বাইরের সতর্কবাণীর সাথে এটা সম্বন্ধযুক্ত। এর এক অংশ পুর্ণ পরিষ্কার। অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজেই জ্বলে বলে মনে হয়। এ দিক দিয়ে 'পরিষ্কার' ও 'স্বচ্ছ' দ্বারা এর তেল স্বতঃ জ্বলে, যদিও তা অগ্নি স্পর্শ করেনি' বলা হয়েছে। কোন কোন ওলী এমনও আছেন, যাদের আলো নবীদের সাহায্য ছাড়াই উজ্জলভাবে জ্বলে। আবার কোন কোন নবীদের আলো ফিরেশতাদের সাহায্যে ছাড়াই জ্বলে ওঠে।

স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে মানবাত্মার আলোগুলো। ইন্দ্রিয়ের আলো হচ্ছে প্রথম প্রকারের। ইহা কল্পনার ভিত্তি ও ভূমিকা। কেননা, কল্পনা করা অসম্ভব ইন্দ্রিয় ছাড়া। এরপর চিন্তা ও বুদ্ধির আলোর স্থান এ দিয়ে বুঝা যায়

যে, কাঁচ প্রদীপের মত এবং তাক কাঁচের মতো হয়েছে। এ সব আলোর একের চেয়ে অন্যটি শীর্ষস্থানীয় হলে তাকে نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٌ আলোর উপর আলো' বলা যেতে পারে।

উপসংহার

বিশ্বাসী, নবী ও ওলীদের অন্তঃকরণের বেলায় এ উপমা দেয়া চলে। কাফেরদের বেলায় খাটে না। কারণ, আলো কথাটি দ্বারা সৎপথে চলাকেই বুঝায়।

সৎপথ থেকে বিভ্রান্ত হবে যে ব্যক্তি, সে বাতিল ও অন্ধকারাচ্ছান্ন। শুধু তাই নয় সে আঁধারের চাইতেও আঁধার। আঁধার না সত্য পথে চালাতে পারে, না সৎ পথে চালাতে পারে। কাফেরদের বুদ্ধি অন্ধ মত। ভ্রান্ত পথে চলতে সাহায্য করে তাদের বোধশক্তি। এদের উপমা হচ্ছে ঃ

"গভীর সাগরের আঁধারে নিমজ্জিত লোকের মতো, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এস ঢেকে ফেলে যাকে, আর তার উপরে মেঘমালা ছেয়ে রয়েছে।"

ঢেউ তোলা সাগর হচ্ছে পৃথিবী। এ পৃথিবী ভীষণ বিপদ সঙ্কুল, দুঃখ দুর্যোগপূর্ণ, বিবর্তনে ভরা। যা মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

প্রথম ঢেউ হলো মোহ কামের ঢেউ, যা আত্মার পশুত্ব ভাবকে উত্তেজিত করে এবং ইন্দ্রিয় স্বাধ ও পার্থিব আলো আকাংখা পূর্ণ করার জন্য তাকে মাতিয়ে রাখে। এ সব লোক দুনিয়ার আরাম আয়েশ ভোগ করে চতুষ্পদ পশুর মতো পানাহার করে। দোযখ তাদের ঠিকানা। সুতরাং, অবশ্য এই ঢেউ অন্ধকার হতে বাধ্য।

হিংস্রবৃত্তির ঢেউ হচ্ছে দ্বিতীয় ঢেউ। ইহা আল্লাহকে ক্রোধ, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, কৃপণতা, গর্ব ও ধনাধিক্যের দিকে উত্তেজিত করে। এ ঢেউ অবশ্যই আঁধার হবে। বুদ্ধির শত্রু হচ্ছে ক্রোধ। ইহা সর্বোচ্চ ঢেউ, কেননা, অধিকাংশ সময় দেখা গেছে যে, ক্রোধের ঢেউ উঠলে ইহা কামের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর রূপধারণ করে। তখন বেমালুম ভুলে যায় মানুষ কামনা, লালসার কথা। ক্রোধকে দমাতে পারে না কামনা লালসা।

অসৎ বিশ্বাস, কুচিন্তা ও মিথ্যা ধারণা হলো মেঘ। এটা ঈমান, কুরআন ও মারিফাতে হক হতে আলো অর্জন করার পথের পর্দা। কেননা, মেঘের ধর্ম হলো সূর্য কিরণকে ঢেকে রাখা। সর্ব প্রকার আঁধার ছেয়েছে বলে কুরআনে বলা হয়েছে—

"আঁধারের উপর আঁধার পুঞ্জিভূত।"

এ আঁধারও আল্লাহকে নিকটস্থ জিনিষের জ্ঞান হতে দূরে সরিয়ে রাখে। দুরের জিনিষের জ্ঞানের তো কথাই নেই। এ জন্য কাফেররা নবী (সা)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা বুঝতে অক্ষম হয়েছে। অথচ, তা সামান্য চিন্তা করলেও বুঝা যায়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْيَرٰىهَا -

"যখন সে নিজের হাত বের করে, তখন তা-ও দেখতে পায় না।"

সকল আলোর উৎসমূল আল্লাহর তা'আলার। অতএব প্রত্যেক একত্ববাদীর এ বিশ্বাস করা উচিত ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ نُوْرًا فَمَالَهٗ مِنْ نُّوْرًا -

"আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোন আলো নেই।" এ আয়াতের এইটুকু রহস্য বর্ণনাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

তৃতীয় অধ্যায়

সত্তর হাজার পর্দার ব্যাখ্যা

নবী (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর আলো আঁধারের সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে। তিনি যদি ঐগুলো অপসারণ করতেন তবে প্রতিটি দর্শককে তাঁর মহান আলোকরাশি জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করতো।

কোন বর্ণায় সত্তর জাহার আবার কোন বর্ণনায় সাতা'শর কথা উল্লেখ আছে।

আমি এখন বলছি যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তার জন্য নিজেই প্রোজ্জল। পর্দা গোপনীয়তার জন্য ব্যবহৃত হয়। পর্দাকৃত লোক তিনভাগে বিভক্ত–

ক. যারা শুধু আঁধারের পর্দায় রয়েছে।

খ. যারা শুদু আলোর পর্দায় রয়েছে।

গ. যারা আলো ও আঁধারের পর্দায় রয়েছে।

এ তিন ভাগের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এগুলোর সংখ্যা গণনা করার চেষ্টা করবো। তবে আমি একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি না যে, এর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য না সংখ্যাগুলোই মূল উদ্দেশ্য। সত্তর হাজার বা সাত'শ নির্ধারিত করা সম্পর্কে নবুওয়াতী শক্তিই বুঝতে পারে। তবে আমার ধারণা এখানে উল্লেখিত সংখ্যা দ্বারা নির্ধিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয় নি। তবে সংখ্যা বর্ণনা করা মানুষের নিয়ম-নীতি। এটা দ্বারা আধিক্যই বুঝানো হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আমি আমার সাধ্যমত এই তিন ভাগ ও তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্ক বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

প্রথম শ্রেণী

আঁধারের মধ্যে আবৃত যারা, তারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এরা নাস্তিক আল্লাহর অবিশ্বাসী। তারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে না। তারা পরজীবনের চেয়ে ইহজীবনকে অগ্রাধিকার দেয়। যেমন আল্লাহ

বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الاٰخِرَةِ ـ

"তারা পরকালের চেয়ে পার্থিব জীবন পসন্দ করে।"

এরা দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

১। যারা এই পৃথিবী সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। কিন্তু তাদের প্রকৃত একে অসম্ভব বলে মনে করে। অথচ প্রকৃতি এমন একটি গুণ যা জড় পদার্থের মধ্যে স্থিতিশীল। এটা নিজেই আঁধার। কারণ, এতে অনুভূতি, নিজের সত্তা সম্পর্কে চেতনা এবং না আছে ধারণাশক্তি। এর জন্য আলোও নেই, যা বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখতে পায়।

২। নিজেদের চিন্তায় মগ্ন থাকে যারা। তারা কার্য কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে না। তাদের সত্তা ও লোভ লালসাই হচ্ছে তাদের জন্য পর্দা। কুপ্রবৃত্তির নেশা হতে বেশী অন্ধকার আর কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

اَفَرَ اَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوَاهُ ـ

"আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন যে, আপনা প্রকৃতিকে ইলাহী বলে গ্রহণ করেছে?"

এ কারণেই প্রিয় রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে সব কল্পিত মাবুদের উপাসনা করা হয়, তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সব চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির লোভ-লালসা। এটাও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত–

এক. এক শ্রেণীর লোকেরা পৃথিবীর চরম পাওয়া হচ্ছে নিজের অভাব পূরণ করা বলে মনে করে; পশু প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা। অর্থাৎ বিয়ে শাদী ও পানাহার করা এবং সুন্দর দামী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করা। তারা স্বাদ আহলাদের দাস, তাই তারা তার পুজারী। তারই অনুসন্ধানে নিমগ্ন থাকে। এসব হস্তগত করাকে সৌভাগ্য বলে তারাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। নিজেদের জন্য যারা এগুলো পসন্দ করে, তারা ইতর পশুর সমান। শুধু তা-ই নয় তার চেয়েও অধম। এর চেয়ে আর কি গভীর অন্ধকার আছে। শুধু নিবিড় আঁধারেই নিমজ্জিত তারা।

দুই. অন্য শ্রেণীর মানুষকে দেখা যায় যে, যারা প্রতিষ্ঠা 'জয়' এবং শ্রেষ্ঠত্ব চায়। এ জন্য তারা হত্যা, লুটতরাজে সদা লিপ্ত থাকে, এটা

বেদুইন, জংলী এবং অধিকাংশ নির্বোধদের মতামত। তারা হিংস্রতার আধারে নিমজ্জিত। হিংস্রতার মধ্যে ডুবে থাকাই তাদের ধর্ম।

তিন. এক শ্রেণীর লোক চায় যে, তাদের অত্যাধিক ধন-সম্পদ, অর্থ বৈভবের মালিক হোক। আশা আকাঙ্খা অভাব অভিযোগ, মনের খায়েশ মিটাবার উৎকৃষ্ট হাতিয়ার বলে তারা মনে করে ঐশ্বর্যকে। সম্পদ পূঞ্জিভূত করা এবং তা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে তাদের আসল উদ্দেশ্য। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও উত্তম ঘোড়া, চতুষ্পদ জানোয়ার ক্ষেত-খামার বৃদ্ধি করাই তাদের দিন রাতের একমাত্র সাধনা। তারা মাটির নীচে অর্থ-কড়ি লুকিয়ে রেখে সঞ্চয়ের পাহাড় গড়ে তোলে। আপনারা অবশ্য দেখবেন যে, তারা সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বিপদসঙ্কুল প্রান্তর পরিভ্রমণ করে। নানাস্থানে ঘুরে ফিরে অনেক কষ্ট সহ্য করে। কেনারাবিহীন সাগরে পাড়ি জমায় আর অর্থ সংগ্রহে লিপ্ত থাকে। নিজের জন্য তা খরচ না করে বরং কৃপণতা করে। নবী (সা) তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "স্বর্ণের দাস অর্থের দাস ধ্বংস হোক।"

মাটির মতই স্বর্ণ, রৌপ্য যে দুইটি ধাতব পদার্থ আর একটি সৃষ্টি, এটা মানুষ বুঝতে চায় না। এর চেয়ে আর কি অন্ধকার-অজ্ঞতা হতে পারে। তা দিয়ে যদি অভাব ও চাহিদা মেটানো, প্রয়োজনে তা ব্যয় করা না যায়, তাহলে তা পাথর ছাড়া আর কি হতে পারে!

চার. অন্য আরেক শ্রেণীর বোকা মানুষ আরো চরমে অজ্ঞতার চরমে উঠেছে। তারা যশঃ মান, প্রতিপত্তিকেই সবচেয়ে সৌভাগ্য বলে মনে করে। খ্যাতি, সম্মান ও প্রতি ঘরে তাদের নামের চর্চা তারা কামনা করে। তাদের অসংখ্য হুকুমের দাস, শাসনের লাগাম তাদের হাতে আসুক এটাই তারা সর্বান্তকরণে কামনা করে।

আপনারা তাদের দেখবেন যে, তারা সবসময় আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিজেদের প্রশংসা করে। অথচ তাদের কতিপয়ের ঘরে খাবারের বন্দোবস্তটুকু নেই। অন্য মানুষেরা ঘৃণার চোখে না দেখে, সে জন্য তারা তারা দামী দামী পোশাক পরিচ্ছদে অঢেল অর্থ ব্যয় করে। তারা সংখ্যায় অনেক। তারা সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে গাফিল ও আঁধারের পর্দায় আবৃত রয়েছে। তাদের আত্মা অন্ধ হয়ে গেছে।

হরেক রকম লোকের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা মুখে কালেমা অর্থাৎ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' স্বীকার করে। হয়ত মুসলমানদের ভয়ের কারণে

তারা কালেমা মুখে জপে, অথবা তারা অর্থ-অনুগ্রহ পাবার আশায় ঐ কালেমা মুখে বলে। তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মের পক্ষপাতিত্বের জন্য এমন গোঁড়ামী করে। তারা যদি এ কালেমা দ্বারা সৎকাজের দিকে ধাবিত না হয়, তাহলে এই কালেমা তাদেরকে আঁধার থেকে আলোর পথে আনতে পারবে না। তাদের বন্ধু শয়তান তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবে। আর এই ঈমানের সৌজন্যে তারা খারাপ কাজকে খারাপ এবং সৎ কাজকে উত্তম মনে করে তবে তারা পাপী হলেও একেবারে আঁধারে নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণী

যারা আলো আঁধারের পর্দায় রয়েছে, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তারা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত–

১. যাদের আঁধারে মূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে।

২. যাদের আঁধারের মূল কল্পনার মধ্যে ও

৩. যাদের আঁধারে মূল ফাসিদ বুদ্ধিভিত্তিক কিয়াসের মধ্যে।

ধারাবাহিকভাবে তাদের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১. যাদের আঁধারের মূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি নেই, যে নিজের সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং লোভ-লালসা থেকে বাঁচতে না পারে, আল্লাহর জ্ঞানের জন্য আকাংখা না করে। তাদের মধ্যে প্রথম স্তরে পড়ে মূর্তি পূজারীরা এবং দ্বিতীয় স্তরে দৈত্যবাদীরা। এ দু'টোরও আবার কয়েকটি স্তর আছে ঃ

প্রথম স্তর, মূর্তি পূজারী। এ দলের মানুষদের সাধারণ ধারণা তাদের একজন দেবতা আছে, যে নিজেকে তাদের আধারময় সত্তার উপরে স্থান দেয়। তাদের বিশ্বাস তাদের দেবতা অন্য সকল জিনিষের চেয়ে অধিক প্রতাপশালী এবং উত্তম জিনিষের চেয়েও অতি উত্তম। কিন্তু ইন্দ্রিয় তাদের এমনভাবে আবৃত করে রেখেছে যে, তারা ইন্দ্রিয় জগত হতে সামনে অগ্রসর হয় না। তারা মূল্যবান খনিজ পদার্থ, স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমুক্তো দ্বারা সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরি করে এবং তাদেরকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে। তারা আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য ও গৌরবের আলোয় আবৃত। কিন্তু আধার ঐ আলোকে ঢেকে রেখেছে।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে দূরবর্তী এক স্থানের একদল মানুষ। তাদের কোন মাযহাব ও শরীয়ত নেই। তারা বিশ্বাস করে– তাদের একজন অত্যন্ত সুন্দর দেবতা রয়েছে। তাই তারা কোন অসাধারণ ও পরম সুন্দর ব্যক্তি, বৃক্ষ, অশ্ব প্রভৃতি দেখলে তাকে দেবতা জ্ঞানে সিজদা করে। তারা বলে যে, এ-ই আমাদের দেবতা। তারা আল্লাহর সৌন্দর্যের আলোয় উদ্ভাসিত এবং সাথে সাথে ইন্দ্রিয়ের আঁধারে মিশ্রিত। তারা আলোর রাজ্যে বেশ কিছুটা প্রবেশ করেছ মূর্তি পূজারীদের চেয়ে। তারা ব্যক্তি বিশেষের নয়, সাধারণ সৌন্দর্যের উপাসনা করে। তারা নিজদের হাতে গড়া কৃত্রিম সৌন্দর্যের নয় বরং প্রকৃতির হাতে গড়া সৌন্দর্যের পূজা করে।

তৃতীয় স্তরের মানুষেরা মনে করে যে, আমাদের দেবতা তাঁর আদি সত্তায় আলো। তিনি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মহান সৌন্দর্যশালী, নিজের সত্তার ব্যাপারে গোপন এবং নিজের উপস্থিতিতে রুদ্র। কারো সাধ্য নেই তাঁর কাছে পৌঁছার। তাদের মতে যা অবোধগম্য, তা অর্থহীন। তারা উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য আগুনের মধ্যে পেয়েছে বলে তার আগুনের পূজা করে এবং নিজেদের দেবতা বলে মনে করে। তারা প্রভুত্ব ও গৌরবের আলোতে আচ্ছাদিত এসব আল্লাহর আলোর অন্তর্গত।

চতুর্থ স্তরের মানুষদের ধারণা যে, আমাদের অগ্নির উপর অধিকার আছে। আগুনকে ইচ্ছামতো জ্বালাতে নিভাতে পারি। এ জন্যই তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে যে, যে বস্তুতে প্রভুত্ব ও সৌন্দর্য পাওয়া যায়, আমাদের উপর যার একচ্ছত্র প্রভাব আছে এবং যা উন্নত, উচ্চ, সেই আল্লাহ। এই লোকদের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের কেউ কেউ ধ্রুবতারা আবার কেউ কেউ জুপিটারের পূজা করে। কেউ কেউ গ্রহ-নক্ষত্রেরও পূজা করে থাকে। তারা উচ্চ, উজ্জ্বল, বিজয়, আল্লাহর এই তিন আলো দ্বারা আবৃত। এগুলোও আল্লাহর আলোর অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম শ্রেণীর মানুষদের ধারণা যে, আলো সূর্যের একচেটিয়া অধিকার নয়। কারণ অন্যান্য নক্ষত্রেরও নিজস্ব আলো আছে। যেহেতু আলোর ব্যাপারে আল্লাহর অংশীদার নেই, সেহেতু তারা পরম আলোকেই পূজা করে। তারা মনে করে যে, এ আলোই বিশ্বপ্রভু এবং সব সৌন্দর্য তাঁরই। ঐ সকল মানুষেরা যখন বুঝে যে, অন্যান্য অমঙ্গলকর জিনিষের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে আছে, তথাপি তারা কোনক্রমেই ঐগুলোকে নিজেদের দেবতার

উপর স্থাপন করতে পারে না। তারা পৃথিবীকে আলো ও আঁধারের হাতে সোপর্দ করে। তাই তারা এ দু'টোকে 'ইয়াযদান' ও 'আহরমান বলে অভিহিত করে। এরা দৈত্যবাদী সম্প্রদায়।

২. যাদের আঁধারের মুল কল্পনার মধ্যে এ শ্রেণীর মানুষেরা ইন্দ্রিয় অতিক্রম করেছে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিষ ছাড়াও আরো কিছুর অস্তিত্ব আছে, যা কল্পনাকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই তারা এমন এক সত্তার পূজা করে, যে সিংহাসনে বসে থাকেন। এদের নিম্নতম স্তরে দেহবাদীরা রয়েছে। অতঃপর এই সিংহাসন বাদীরা অসংখ্য দলে বিভক্ত রয়েছে। এদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আমি জানি না। তবে তাদের মধ্যে উঁচুস্তরের এমন লোক আছেন, যারা আল্লাহকে দেহধারী মনে করে না। তাদের মধ্যে এমন ধারণাও রয়েছে যে, আল্লাহ স্থানের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

৩. যাদের চুক্তিভিত্তিক কিয়াসের মধ্যে আঁধারের মুল ফাসিদ তারা এমন এক উপাস্যের পূজা করে যে, শ্রোতা, দ্রষ্টা, জ্ঞানী, শক্তিশালী, জীবিত ও দিকমুক্ত। তারা ঐ গুণাবলীকে নিজেদের মতো মনে করে। এমন কি তাদের কেউ কেউ বলে যে, "তাঁর কথা আমাদের কথার মতো শব্দ ও অক্ষরে প্রকাশিত হয়।" আবার অনেকে এর চেয়ে একটু বেশি অগ্রসর হয়ে বলে ঃ "না, তাঁর কথা আমাদের অন্তরে চিন্তার মতো অক্ষরও শব্দহীন।"

তাদেরকে আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন ও জীবনের মর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তারা এমন জিনিষের আশ্রয় গ্রহণ করে, যা আল্লাহর উপর মানবীয় গুণ আরোপ ছাড়া আর কিছু নয় যদিও বাহ্যিকভাবে তারা তা স্বীকার করে না। এ শব্দগুলো আল্লাহতে আরোপ করার প্রকৃত তাৎপর্য তারা বুঝে না। তাই তারা ইচ্ছা সম্পর্কে বলে যে, তাঁর ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার মতো নতুন পুরোনো নয়। আল্লাহ আমাদের মতো ইচ্ছা করে ও দাবী করে। এটা একটি প্রসিদ্ধ মাযহাব। এ সব লোক কোন কোন আলোতে আবৃত থাকা সত্ত্বেও ফাসিদ বুদ্ধির কিয়াসের আধারে নিমজ্জিত।

যারা শুধু আলোর পর্দায় রয়েছে, তারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত। আমি তাঁদের মাত্র তিনটি শ্রেণী সম্পর্কে বর্ণনা করবো।

এক. যারা আল্লাহর গুণাবলীর সত্য অর্থ জ্ঞাত হয়েছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে, কালাম, ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি আল্লাহর গুণাবলীকে

এভাবে অভিহিত করা হয় না, যেভাবে মানুষের বেলায় হয়। তাঁরা ঐ গুণাবলী দিয়ে আল্লাহকে বুঝতে, বুঝাতে রাজী নন।

সাধারণভাবে তাঁরা সৃষ্টির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। যেমন ফিরাউন হযরত মূসা (আ)-কে প্রশ্ন করলো– "বিশ্বপ্রভু কি?" হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কার্যাবলী সম্বন্ধে জবাব দিলেন ঃ "তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভু।"

দুই. দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থা আরো উন্নত। তাঁরা বুঝেছেন যে আকাশ অনেক এবং প্রত্যেক আকাশের আলাদা করে একজন গতিদাতা ফিরেশতা রয়েছেন। তারাও সংখ্যায় অসংখ্য। ইন্দ্রিয়ের আলোর সাথে তারকার যে সম্পর্ক, আল্লাহর আলোর সাথে তাদেরও সেই সম্পর্ক। তাঁরা আরো বুঝতে পেরেছেন যে, দৃশ্যমান আকাশ অন্য আকাশের অধীনে রয়েছে। ঐ সকল আকাশ দিনরাত ঐ আকাশের অধীনে আবির্তত হয়। উপরোক্ত মহা প্রভু আকাশমণ্ডলিকে ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি এর গতিকে পরিচালিত করছেন। এ কারণে হিসেবে তাঁরা বর্ণনা করে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার বেলা 'বহুত্ব' খাটে না।

তিন. এরা আরো ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, বস্তুর গতিদান হচ্ছে আল্লাহর একটি খিদমত। বিশ্ব প্রভুর খিদমত ও ইবাদত তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে এক ফিরেশতা বান্দা দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয়ের আলোর সাথে চাঁদের যে সম্পর্ক আল্লাহর সাথে চাঁদের যে সম্পর্ক আল্লাহর পবিত্র আলোর সাথে এই ফিরেশতারও সেই সম্পর্ক। তাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহ তা'আলা হচ্ছে এই গতি দানকারী ফিরেশতার মাননীয়। অর্থাৎ আল্লাহ হচ্ছেন তার মান্য করারযোগ্য। আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য আদেশের মাধ্যমে গতি সৃষ্টি করেছেন কাজের মাধ্যমে করেন নি।

আমি উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে চেষ্টা করেছি। তবে আধ্যত্মিক রুচিহীন ব্যক্তি এর মর্ম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না বলেই আমার মনে হয়।

এ সকল স্তর শুধু আলো দ্বারা আবৃত। এতে আঁধার নেই।

যারা অক্লান্ত সাধনার বলে এখানে পৌঁছতে পারে, তাঁরা কৃতকার্য হন এবং তাঁদের নিয়ে এক চতুর্থ শ্রেণী গঠিত হয়। তাঁদের নিকট বিষয়টি খুবই

স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, এই মান্যবর مُطَاعٌ আল্লাহ খাঁটি একত্বগুণের সাথে গুণান্বিত। তাঁর বাস্তব অস্তিত্বের সাথে এমনই সম্বন্ধ, যেমিন সূর্যের সাথে আলোর বা আগুনের সাথে স্ফুলিঙ্গের সম্পর্ক। অতঃপর তাঁরা এখান থেকে যে গতিদাতা আকাশমণ্ডলীকে পরিচালিত করেন এবং তাদের পরিচালনার আদেশ প্রদান করেন, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে তাঁরা এমন এক সত্তার কাছে পৌঁছে যান, যিনি মানুষের আচরণ থেকে পবিত্র। এ দলও কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

এক শ্রেণীর মানুষের মতে এই পৃথিবীর সব বিষয়বস্তু জ্বলে যায়, ধুয়ে যায়, মুছে যায়, তবুও তাঁরা পবিত্র সৌন্দর্যের ধ্যান করতে থাকেন এবং নিজেদের সত্তা ও সৌন্দর্য দেখতে পান; তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের ফলে এ পরম সৌন্দর্য লাভ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে যত কিছু দৃষ্ট হয়, সব দূর হয়ে যায়, মিশে যায়।

আরেক শ্রেণীর বিশিষ্ট মানুষ উপরোক্ত শ্রেণীর মানুষদেরও অতিক্রম করেছেন। তাঁদের উচু সত্তার ঔজ্জ্বল্য তাঁদেরকে জ্বালিয়ে দেয় এবং তাঁরা আল্লাহর গৌরবাবৃত হন। তাঁরা করতে পারেন না আত্মচিন্তাও। কারণ তাঁরা আত্মা হতে বেপরওয়া হয়ে যান। তাঁদের অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যার সমর্থনে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াত প্রণিধানযোগ্য ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهُهُ -

"তিনি ছাড়া আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এ শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আমি এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে সামান্য আলোচনা করেছি।

অন্য আরেক শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতির জন্য পর্যায়ক্রমে আরোহন করেন না। এ সকল পথ চলতে দীর্ঘ সময়ও লাগে না তাঁদের। প্রথম পদক্ষেপেই তাঁরা পরম পবিত্র আল্লাহকে চিনেন। তাঁরা প্রথমেই যে জ্ঞানার্জন করেন, অপরের বেলায় তা সর্বশেষে অর্জিত হয়। আল্লাহ্র চমকীত আলো হঠাৎ তাঁদের উপর পড়ে। ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি যা বুদ্ধির অর্ন্তদৃষ্ট দ্বারা বোধগম্য বস্তুকে আল্লাহর তেজক্রিয়তায় জালিয়ে দেয়। এ অবস্থাকে এ-ও বলা যায় যে, প্রথম পথ ছিলো হযরত ইব্রাহীম খরীলুল্লাহর

এবং দ্বিতীয় পথ ছিল নবী মোহাম্মদ (সা)-এর। আল্লাহ তা'আলাই তাঁদের মনজিলগুলোর আলো এবং তাঁদের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে ভাল জানেন।

পর্দার আচ্ছাদিত মানুষদের এখানে শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দেয়া হলো এটা আশ্চর্য নয় যে, এই মনযিলগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করলে এবং এ পথ যাত্রীদের পর্দাগুলোর অনুসন্ধান করলে তাঁদের সংখ্যা সত্তর হাজারে দাঁড়াবে। আপনার সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকালে উল্লেখিত শ্রেণী বিভক্তির বাইরে কোন কিছু দেখতে পাবেন না।

আমি উপরোক্ত আলোচনা আপনাদের প্রশ্নোত্তরে করার সুযোগ পেলাম। প্রশ্ন করার সময় আমার মন চিন্তাযুক্ত ছিল, অন্য বিষয়ে আমার মনোযোগ নিবন্ধ ছিল, আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ আমার এই যে, ভুল-ত্রুটি হলে আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কেননা, স্রষ্টার গূঢ় রহস্যের মহাসাগরে ডুব দেয়া খুবই কঠিন ও বিপদ সঙ্কুল ব্যাপার ঃ উচ্চতর আলোর পর্দাগুলো উপর থেকে উন্মোচন করা সহজ নয় বরং অত্যান্ত দুষ্কর।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ ـ

সমাপ্ত